সুবর্ণ সংবাদ

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর

সুবর্ণ সংবাদ
বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
অধ্যাপক আখতার সুলতানা
অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

সম্পাদক
ফাহমিদুল হক

সম্পাদকীয় সদস্য
শাওন্ড্রী হায়দার
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

প্রচ্ছদ
শিবু কুমার শীল

কারিগরী সহযোগিতা
অসীম কুমার দাশ

প্রকাশকাল
মে, ২০১৩

মূল্য: ৫০ টাকা

Subarana Sangbad
(Golden News: 50 Years of Journalism Education in Bangladesh)
A publication by the Department of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh on the eve of 50 years celebration of the department; published by the chairperson of the department from University of Dhaka in May, 2013; price BDT 50.

সূচি

গৌরবময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: অতীত ও বর্তমান বাস্ড়বতা
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম ০৯-১৬

বিভাগের আদ্যকথা: যেন ভুলে না যাই
সাখাওয়াত আলী খান ১৭-২২

সাংবাদিকতা শিক্ষা ও পেশা: ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
ফাহমিদুল হক ২৩-২৮

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর: পেশাদারির সংকট ও সম্ভাবনা
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ২৯-৩৬

Expansion and Modernization of Journalism Education in Bangladesh
Professor Dr. Sakhawat Ali Khan and Dr. Abul Mansur Ahmed 37-42

Press Ethics in Bangladesh: Concepts and Practices
Dr. Sudhangshu Sekhar Roy 43-51

Media Ethics and Professionalism: Dynamics in a Developping Country
Md. Golam Rahman, PhD 53-65

"'বিশ্বস্ড়সূত্রে', 'গোপনসূত্রে' লিখতে লিখতে দুই হাতের দশ আঙ্গুল পঁচাইয়া ফেললাম...হে হে হে..."
কাবেরী গায়েন ৬৭-৭৪

বাংলাদেশে প্রসারমান মিডিয়া-সংস্কৃতি
আ-আল মামুন ৭৫-৮৩

ভিন্নমতহীন মিডিয়ার যুগে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের ব্যক্তিগত ইতিহাস
সেলিম রেজা নিউটন ৮৫-৯২

টেলিভিশন: একটি নিত্যব্যবহার্য 'ইডিয়ট বক্স'
খ. আলম ৯৩-৯৮

টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের ঝোঁক ও প্রবণতা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
রোবায়েত ফেরদৌস ৯৯-১০৯

Broadcast Journalism in Bangladesh and Its Future
Samia Rahman 111-116

Bengali or Muslim?: Islam, Identity and Art Cinema in Contemporary Bangladesh
Zakir Hossain Raju 117-127

মিডিয়ার কাছে মানুষ কী চায়
মীর মাসর"র জামান ১২৯-১৩৪

Connecting theories to practice: Humanitarian Communication
Mubashar Hasan 135-142

একটি সাধারণ কৃতজ্ঞতা পত্র
রেজানুর রহমান ১৪৩-১৪৮

সাহসী সাংবাদিকদের গল্প
সুজন মেহেদী ১৪৯-১৫৭

সুবর্ণজয়ন্ড়ী উৎসব উদ্‌যাপনের সফট নিউজ
আল আমিন খান ১৫৯-১৬২

ফটো অ্যালবাম
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অতীত ও ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ১৬৫

Message

My heartiest congratulations goes to the members of the Mass Communication and Journalism (MCJ) family for their wonderful initiative to publish a souvenir on the occasion of celebration of its 50 years journey and its glorious history of excellence in the fields of academic and professional journalism.

Today we are facing unprecedented perils and challenges in our media arena. Challenges like 'poverty in professionalism', 'poverty in intellectual upbringing' and 'ethical dialectics' are to be dealt with seriously. The task is enormous, it is a gigantic job no single individual, no single party can accomplish the job alone. Therefore, a collective effort is a must. the MCJ family has to take the lead in this crucial phase.

the department of Mass Communication and Journalism is such a family that finds above in the heart of each and every member.

I am proud of being a member of this MCJ family and the beautiful caravan that started its journey 50 years ago.

I wish the upcoming programme a grand success.

Professor Dr. A A M S Arefin Siddique
Vice chancellor

Message

I am very much glad to hear that the department of Mass Communication and Journalism [MCJ], University of Dhaka is celebrating the golden jubilee of their journey and media education in Bangladesh.

I do believe, journalism is a privileged socio-cultural platform. It is such a noble profession that carries noble values, bears duties and responsibilities towards the people and society. The MCJ family is our pride. I believe the glorious history and achievements of last 50 years would motivate the members' the family in the coming years. together we will build a successful nation.

I wish their efforts and missions will be of great success.]

Dr. Farid Uddin Ahmad
Dean
Faculty of Social Science

Message

This is the year of our Golden Jubilee celebration. As we celebrate the golden jubilee year I would like to look back to the achievements accomplished in the last five decades. Starting with only an evening diploma course with a handful of students, today we can proudly boast of an excellent four-year undergraduate program and one-year Master's program with more than 300 students. As we scan the media industry in our country, both electronic and print, our alumni are to be found everywhere. In the field of communication too, be it advertising or public relations, our graduates have made a mark for themselves. This feat has been accomplished by the combined efforts of both academicians and students. We have worked together to make our department stand out in the field of communication and journalism. We have visions for the future, too. Keeping up with the modern trends, we plan to develop our Department of Mass Communication and Journalism with the needs and requirements of the time so that our students can boldly face the challenges posed to them. Our past has been bright but our future will be brighter.

I am confident that our graduates will be able to perpetuate the rich traditions that we have established and win laurels for themselves.

Long Live the Department of Mass Communication & Journalism!!!

Professor Akhtar Sultana
Chairperson

সম্পাদকীয়

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বয়স ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। এই সুবর্ণ সময় পার করাটা যেকারও জন্যই আনন্দের; এই আনন্দ চূড়া স্পর্শ করেছে বিভাগের শিক্ষক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, কর্মচারী প্রত্যেকেই, আয়োজিত মহা অনুষ্ঠানে, সামিল হবার কারণে। বছরব্যাপী নানান অনুষ্ঠানমালায় সপ্তবর্ণে রঙিন হয়ে উঠেছে এই আনন্দযজ্ঞ।

৫০ বছর বাংলাদেশের সাংবাদিকতায়, যোগাযোগ পেশায় বিভাগটির অবদান কী? খোদ সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতিই বা কী এদেশে? তাই কেবলই আনন্দোৎসব নয়, ৫০ বছর পূর্তির এই প্রকাশনায় আমরা এসবের কিছুটা বিচারও করতে চেয়েছি। বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ধরন গত দেড় দশকে পাল্টেছে। রাজনীতিবিদদের হাত দিয়ে আদর্শিক অবস্থান থেকে যে সাংবাদিকতা শুর হয়েছিল তার খুব কমই অবশিষ্ট রয়েছে। এখন ব্যবসায়িক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকতায় বিনিয়োগ করেছে। ফলে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আদর্শিক সাংবাদিকতার পরিবর্তে হাজির হয়েছে পেশাদারি সাংবাদিকতা। এই পেশাদারিত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দরকার দক্ষ ও পেশাদার সাংবাদিক-বাহিনীর। দেশে এখন মুদ্রণ, সম্প্রচার, অনলাইন – নানামুখী সাংবাদিকতা বিস্ড়ার লাভ করেছে। ফলে সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই।

একসময় সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন কেউ অনুভব করতো না। কিন্ড় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, মুদ্রণের পাশাপাশি বেতার ও টেলিভিশনে এবং অনলাইনে সাংবাদিকতার পরিধি বিস্ড়ৃত হয়েছে। এইসব নতুন ধরনের সাংবাদিকতায় টেকনিক্যাল ও প্রাযুক্তিক জ্ঞান দরকার যা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা শিক্ষা গ্রহণ না করে যারা সাংবাদিকতা করতে চান, তাদের জন্য তাই প্রশিক্ষণ খুব জর রি। এ ছাড়া রয়েছে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রতিনিধিরা, যাদের জন্য প্রশিক্ষণ ছাড়া গত্যন্ড়র নাই। সংবাদ লিখবার কলাকৌশল ছাড়াও সাংবাদিকতার রয়েছে একটি নৈতিক দিক যা তাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়ন করা জর রি। সাংবাদিকতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুসাংবাদিকতার ধারণা দেয়।

কর্মক্ষেত্রে মানবসম্পদ সরবরাহ করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য অন্য কাজও রয়েছে। সাংবাদিকতার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করাও তার কর্মপরিধির মধ্যে অন্যতম বিষয়। ফলে ঠিক যেরকম জনশক্তি ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন তার ঘাটতিটুকু ইন্ডাস্ট্রিকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়ায় নি। আজ প্রয়োজন পড়েছে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত উদ্যোগে নিজেদেরই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার, যার মধ্য দিয়া এই মুহূর্তে যেরকম মানবসম্পদ প্রয়োজন তা তৈরি করা সম্ভব হবে।

সাংবাদিকতার নীতিসমেত, নিজ-রাষ্ট্র-কর্পোরেটের চাপমুক্ত, স্বাধীন সাংবাদিকতাই হোক আমাদের আরাধ্য। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫০ বছর পূর্তিতে আমাদের স্ াগান হয়েছে – স্বাধীন গণমাধ্যমই গণতন্ত্র।

গৌরবময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: অতীত ও বর্তমান বাস্ড়বতা

অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম

বাংলাদেশের ইতিহাস আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ দু'য়ের মাঝে যেন কোনো সীমারেখা নেই – সবকিছু মিলেমিশে একাকার। অর্জন, অহংকার আর আন্দোলনের সূতিকাগার এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৮৯ বছর ধরে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি আপসহীন, বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী চেতনার প্রতীক হিসেবে। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র সাধারণ নির্বাচন ও মহাপ্রলয়ে গণতন্ত্র ও মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া আর একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানে অনবদ্য আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জয়যাত্রার সকল সংগ্রামে ভ্যানগার্ড বা অগ্রসৈনিক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষকবৃন্দ। বায়ান্ন থেকে ৭১'র সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ একইসূত্রে গাঁথা; আর সেই রক্তাক্ত মালার মালাকার আমাদেরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জনৈক মার্কন বিচারক বলেছিলেন, "সূর্যের আলোতে অসংখ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমনই একটি সূর্যের নাম যার রশ্মিতে পুড়ে যেতে হয়েছে অনেক অশুভকে, আর আলোকিত হয়েছে পুরো বাংলাদেশ। ধ্বংস হয়েছে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার সব জীবাণু। মুক্তির সাংগ্রামে এবং গণতন্ত্র সুসংহত রাখতে দেশের প্রাচীনতম এই বিশ্ববিদ্যালয় বারবার জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছে। একটি শিক্ষায়তন কোনো দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য বদলে দিতে পারে এমন নজির সৃষ্টিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের পরিক্রমায় ৮৯টি বসন্ড় পেরিয়ে এখন মহীর হ। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথপরিক্রমা সহজ ছিল না। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯২১ সালের ১ জুলাই যাত্রা শুর হয় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুর হয়। ১৯২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্র তি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। এর মাত্র তিন দিন পূর্বে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল াহ, ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট। সেবছরই ডিসেম্বর মাসে সেটি অনুমোদিত হয়। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্ড়াব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইনসভা পাশ করে 'দি ঢাকা

ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট'-১৯২০।

সে সময়কার অভিজাত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রমনা এলাকার প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশের পরিত্যাক্ত ভবনাদি এবং ঢাকা কলেজের ভবনসমূহ (যা বর্তমানে কার্জন হল নামে পরিচিত) সমন্বয়ের মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনটি অনুষদ ও বারটি বিভাগ নিয়ে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। যাত্রাকালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন; শিক্ষক ৬০ জন। সেসময় প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এফ সি টার্নার, ড. মুহাম্মদ শহীদুল াহ, জি এইচ ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, ডবি উ এ জেনকিন্স, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার এ এফ রহমান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সেনগুপ্ত প্রমুখ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'ডাকসু' এক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আপসহীন, বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী চেতনার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস ডাকসু। তবে ডাকসুর বর্তমান যে রাজনৈতিক রূপ, শুরুতে এরকম ছিল না। এটা ছিল একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক চরিত্রের। হল ছাত্র সংসদের সাফল্যের পর ১৯২২-২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (Dhaka University Student's Union-DUSU) গঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অস্থিরতা ও ভারত বিভাগ আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের পর ৩৫জন সিনিয়র হিন্দু শিক্ষক দেশত্যাগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনে এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জমি ও ভবন অধিগ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুরু হয় সরকারি হস্তক্ষেপ। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হয়। নতুন উদ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ৫৫টি কলেজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৫টি নতুন অনুষদ, ১৬টি নতুন বিভাগ ও চারটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে এই বঙ্গের মানুষের বিরোধের সূত্রপাত ভাষার প্রশ্নে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন "Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan"। সেখানে উপস্থিত ছাত্ররা 'No No' বলে শে াগান দেয়। একই বছর নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরের সময় বাংলা ভাষার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ধর্মের ইস্যুতে জন্ম নেওয়া পাকিস্তানের ফাটলের সূত্রপাত ঘটে এখান থেকেই। অধ্যাপক আবুল হাশিম এবং তৎকালীন সচেতন ছাত্ররা মিলে গঠন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ফজলুল হক হলে নিয়মিত বৈঠক করতেন এই পরিষদের ছাত্রনেতারা।

১৯৫২ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনে সাধারণ ধর্মঘটের ডাকে বিচলিত হয়ে পড়ে। ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি, সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ

ঘোষণা করে। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি-না সে বিষয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ একমত হতে না পারায় সভার সভাপতি আবুল হাশিম বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকে। সবার মুখে একটাই কথা – "১৪৪ ধারা মানি না, মানবো না; ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, ভঙ্গ কর; রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই"।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন গণপরিষদ ভবনে বাজেট অধিবেশন ছিল। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গণপরিষদের দিকে যাত্র করা। দশজনের এক একটি দল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লে াগান দিয়ে গেট অতিক্রম ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে প্রচণ্ড পুলিশি হামলার শিকার হয়। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ, ব্যাপক কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সিটি এসপি মাসুদের নির্দেশে বেপরোয়া গুলি চালানো হয় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন রফিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞনের এম এ শেষ পর্বের ছাত্র আবুল বরকত গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরে অপারেশনের টেবিলে তার মৃত্যু হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলি চালানোর প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ওই দিনই সন্ধ্যায় প্রকাশিত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার টেলিগ্রাম সংখ্যা এবং ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম দেয়া হয় 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ'। নবাবপুর রোডে ২২ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীন হয়েছিলেন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন, পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পরিষদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের পুরো বাংলা ফুঁসে ওঠে এবং আন্দোলনে নামে। আন্দোলন অব্যাহত থাকে। চাপের মুখে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় শাসকগোষ্ঠী। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার অধিকার আদায়ে এমন সংগ্রামের ইতিহাস বিরল। এর স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"-এর স্বীকৃতি প্রদান করে।

ষাটের দশক পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলায় বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সামরিক স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামের কাল। ষাটের দশকের শুরুতে পূর্ববাংলার অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাকর্মী থাকতেন কারাবন্দি অথবা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা হুলিয়া মাথায় ফেরারি হিসেবে। এভাবে আন্দালনের নেতৃত্ব ছাত্রনেতাদের কাঁধে এসে পড়ে। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর 'এনএসএফ' বা 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন' নামে একটি দালাল ছাত্র প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৬২ সালের মধ্যে আগস্টে শিক্ষা আন্দোলন রাজপথে নেমে আসে এবং তা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৭ সেপ্টম্বর। রক্তাক্ত দিনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'শিক্ষা দিবস' নামে পরিচিত। সেদিন আহূত হরতালের সমর্থনে কলাভবন থেকে একটি জঙ্গি মিছিল বের হয় সিরাজুল আলম খান, মহিউদ্দিন আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ ছাত্রের নেতৃত্বে। শোভাযাত্রাটি হাইকোর্ট অতিক্রম করে

সেক্রেটারিয়েট রোডে প্রবেশকালে পেছন থেকে পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হন বাবুল, গোলাম মোস্ড়ফা এবং পরে হাসপাতালে ওয়াজিউল াহ। জেনারেল আজম খান গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে এবং ড. মাহমুদ হোসেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৬২ সালের সমাবর্তনে তৎকালীন উপাচার্য ড. মাহমুদ হোসেন দেশে চলমান সমরিক শাসনের প্রতিবাদে বলেছিলেন "সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে সীমারেখা টানাই হচ্ছে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য"। সাহসী উপাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হন ড. ওসমান গণি। ষাটের দশকের অধিকাংশ সময় জুড়ে গভর্নর মোনেম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (২৬ অক্টোবর ১৯৬২ থেকে ২২ মার্চ ১৯৬৯) এবং ড. এম এ গনি ভাইস চ্যান্সেলর (২৩ ফেব্র"য়ারি ১৯৬৩ থেকে ১ ডিসেম্বর ১৯৬৯) ছিলেন, যে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের গুর"ত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটেছিল।

১৯৬৭ সাল থেকে পাকিস্ড়ানের ক্ষমতাসীন সামরিক-আমলা-শিল্পপতি শাসক ও শোষক চক্র বাঙালি জাতির বির"দ্ধে চূড়ান্ড় আগ্রাসন শুর" করে। পাকিস্ড়ানি ফ্যাসিস্ট চক্র এই বাঙালি শায়েস্ড়া অভিযান শুর" করেছিল শেখ মুজিবের ৬-দফাভিত্তিক পূর্ববাংলা স্বাধিকার অর্জনের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ভীতসন্ত্রস্ড় হয়ে। স্মরণ করা যেতে পারে, শেষ মুজিবের ৬ দফা দাবির উত্তরে পাকিস্ড়ানের স্বৈরাশসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান 'অস্ত্রের ভাষায়' জবাব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই অস্ত্রের ভাষার প্রথম বহিঃপ্রকাশ 'আগরতলা ষড়যন্ড় মামলা'। শেখ মুজিবকে জড়িয়ে উনসত্তরের গণআন্দোলন গণবিস্ফোরণের পথ রচনা করে দিয়ে আইয়ুব খান নিজের পতনের পথ নিজেই নির্মাণ করেছিলেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আইয়ুব-বিরোধী গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র পূর্ব পাকিস্ড়ানব্যাপী। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ১১-দফার ভিত্তিতে গঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-যুবক আবার সমবেত হয় কলাভবনের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের করে। এদিন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে ঠা"া মাথায় অত্যন্ড় কাছ থেকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ২৪ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করা হয়; কিন্তু দিবসটি পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থান দিবসে। দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ আর জঙ্গি মিছিল, জনতার ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর বারবার গুলিবর্ষণের ফলে ঢাকাতেই সেদিন অন্ড়ত ৬ জন ছাত্র-জনতা নিহত হয়।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্র"য়ারি সকালে সার্জেন্ট জহুর"ল হককে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিশালায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্ড়ানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি আল ামা ইকবালের নামে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাস 'ইকবাল হলে'র নাম পরিবর্তন করে 'জহুর"ল হক হল' নামকরণ করে। ১৮ ফেব্র"য়ারি ড. শামসুজ্জোহার শাহাদতবরণ উনসত্তুরের গণআন্দোলনকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে; যার ফলে শুধু আগরতালা মামলাই বন্ধ হয়ে যায়নি, পাকিস্ড়ানের স্বৈরশাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানেরও পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ২২ ফেব্র"য়ারি কারামুক্ত হন শেখ মুজিবুর রহমান। ২৩ ফেব্র"য়ারি রমনার জনসমুদ্রে ডাকসু ভিপি তোফয়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ষাটের দশকে আইয়ুব খানের চীনপন্থী পররাষ্ট্রনীতির কারণে পিকিংপন্থী বামপন্থী রাজনীতিকরা আইয়ুব খানের প্রতি নমনীয় এবং শেখ মুজিবের ৬-দফার বিরোধী ছিলেন। ফলে চীনপন্থী বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা জেল থেকে ছাড়া পান। যাদের বির"দ্ধে হুলিয়া ছিল সেগুলো তুলে নেওয়া হয়। '৬৯-এর গণআন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতেও পরিবর্তন আসে। স্মরণীয় যে, পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) উভয় গোষ্ঠী ১৯-দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্ড়র্ভুক্ত এবং আইয়ুব-বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্বে সক্রিয় ছিল।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে এক ঐতিহাসিক সভায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল পৌনে দশটায় তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ স ম আবদুর রব সর্বপ্রথম লাল-সবুজ জমিনের পটভূমিতে লাল সূর্যের বৃত্তের সোনার বাংলার মানচিত্র সংবলিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ৩ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানের এক বিশাল জনসভায় ৭ মার্চ পর্যন্ড় আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এদিন পল্টন ময়দানের সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত ঘোষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করা হয়। পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে শুর" হয়ে যায় সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। এই সভায় তাঁর উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' কার্যত যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে অনুরনিত করে তোলে।

এরপর আসে ২৫ মার্চের ভয়াল কালোরাত। শুর" হয় বেঈমান পশ্চিম পাকিস্ড় ানিদের অপারেশন সার্চ লাইট। রাতের আঁধারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে পাকিস্ড়ানি হানাদাররা চালালো বর্বরোচিত হামলা। হায়েনাদের আক্রোশের কেন্দ্রস্থল এই ক্যাম্পসটি তখন মৃত্যুপুরী। এসময় হত্যা করা হয় জি সি দেব, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাসহ আরও অনেককে। জগন্নাথ হল, ডাকসু নেতাদের আখড়া ইকবাল হলে চালানো হয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। ঐ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, ২৬ কর্মচারীসহ অসংখ্য মেধাবি ছাত্রের প্রাণপ্রদীপ নিভে যায় পাক হানাদারদের বুলেট আর বেয়োনেটের আঘাতে। এরপর ১৪ ডিসেম্বর বিজয়ের একদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত কয়েকজন শিক্ষককে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে হায়েনারা। নিশ্চিত পরাজয় জেনে দেশকে মেধাশূন্য করতেই এ হত্যাকা ।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ডাকসু নেতারা যুদ্ধবিধ্বস্ড় দেশ গঠনে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০/১২ জন করে ছাত্রের একটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। ছাত্র ব্রিগেড বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ডাকসুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রসমাজের বহুমুখী কর্মকা ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়। আবাসিক ছাত্রদের আসনসংকট মোকাবিলায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ছাত্ররাই অস্থায়ী কিছু টিনশেড নির্মাণ করে। সেবছর বন্যা হয়।

কৃষকের ফসল যাতে পুনরায় ঘরে তুলতে পারে তার জন্য রেসকোর্স ময়দান ও মহসিন হল খেলার মাঠে বীজতলা তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীরা। পরে তা সরাসরি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষাভাবনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয় ডাকসু বার্তা। মুক্ত স্বদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকা"কে বেগবান করার জন্য ডাকসুর সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয় নাট্যচক্র। ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকা"ে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক, মঞ্চায়ন চলতে থাকে হলে হলে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে। ডাকসুর তখনকার আরেকটি অনবদ্য অবদান হলো 'অপরাজেয় বাংলা'র নির্মাণ।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, সামরিকতন্ত্রী ও স্বৈরতন্ত্রী এবং তাদের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নানা লেবাসে নানা কায়দায় এ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনীতিতে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে রাখে। স্বাভাবিকভাবেই তারা চায়নি দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ। অশুভ শক্তির হস্ড়ক্ষেপের ফলে ছাত্ররাজনীতিতে ঢুকে পড়ে অস্ত্রের মহড়া, দখল-দৌরাত্ম্য, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি। বিরাশি সালের ২৪ মার্চ সমরিক শাসনের মাধ্যমে এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে ছাত্রহত্যা ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার আইয়ুবের এনএসএফ এর অনুকরণে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ গঠন করে। ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে সামারিক সরকারের বির"দ্ধে আন্দোলনে মাঠে নামে ডাকুস। ২৮ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায় কয়েকজন ছাত্র। ১৯৮৭ সালের এক বড় অংশ জুড়ে জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে মেধাবি ছাত্র মুন্না গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। মুন্না ছিল শহীদুল াহ হলের আবাসিক ছাত্র ও জাসদ ছাত্রলীগ কর্মী। সংঘর্ষের পরিস্থিতিতেই গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ। সকল সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিল এর সদস্য। পরিবেশ পরিষদের মাধ্যমে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ছাত্র সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালানো হয়। ১৯৮৭ সালে পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য অনেকগুলো সিদ্ধন্ড় গ্রহণ করে। যদিও সিদ্ধান্ড়গুলো বাস্ড়বায়ন হয়নি। একই বছর প্রথম দিকে ২২ ছাত্র সংগঠনের ঐক্য গড়ে ওঠে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রশ্নে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসলামের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনার পরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল। তখন জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনকে আবার হিমাগারে ঠেলে দেয়। এই সংঘর্ষের পর ২২ দলীয় ঐক্য ভেস্ড়ে যায়। তবে ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ আন্দোলনে নূর হোসেনের আত্মদান আন্দোলনে নতুন মাত্র যোগ করে।

১৯৮৮ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী সাম্প্রদায়িক শক্তির বির"দ্ধে এক কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলে। সারাদেশজুড়ে নজিরবিহীন বন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। অসাধারণ ভুমিকা পালন করে। বন্যার্তদের মাঝে র"টি বিতরণ, স্বেচ্ছাশ্রমে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় স্যালাইন তৈরির কাজ পরিচালনার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা সারা দেশে সাড়া জাগায়। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও প্রমাণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুরিয়ে যায়নি। ৬ ডিসেম্বর জাতি অর্জন করে আর একটি গণতান্ত্রিক বিজয়।

নব্বই পরবর্তী সহিংসতায় অনেক মেধাবি শিক্ষার্থী প্রাণ হারান। ১৯৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে নিহত হয় মিজান। ১৯৯২ সালের ১০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রাজু। পরবর্তীতে তার নামেই টিএসসি মোড়ে নির্মত হয় সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য। ১৯৯৩ সালে নিহত হয় মনির"জ্জামান বাদল, ১৯৯৫ সালে নিহত হয় বাপ্পী, ১৯৯৮ সালে সূর্যসেন হলের সামনে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় এক ছাত্রলীগ নেতা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র পার্থ প্রতীম আচার্য্য।

২০০২ সালের ২৩ জুলাই শাসসুন্নাহার হলের ভেতরে ঢুকে ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় পুলিশ। প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা ছাত্র আন্দোলনে পদত্যাগে বাধ্য হয় ভিসি ড. আনোয়ারউল াহ চৌধুরী। ২০০৪ সালে ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সংগঠনের মিছিলে অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রদল। সেদিন ছাত্রদলের একদল ক্যাডার লেকচার থিয়েটারে তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কক্ষ ভঙচুর করে।

৯০'র পর দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসলেও বাধাগ্রস্ড় হয়েছে। প্রাণ ফেরেনি ডাকসুতে। মজার ব্যাপার হলো দেশে যখন গণতন্ত্র ছিলনা তখন ডাকসু ছিল; কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও কার্যকর ছাত্রসংসদ অনুপস্থিত থাকায়, ছাত্ররাজনীতেতে নেতৃত্ব বিকাশের পথও র"দ্ধ হয়ে যায়।

ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টস জরিপে ২০০৯ সালে বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালরে তালিকা প্রকাশ করে। এই জরিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৪ হাজারের পরে। অথচ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল সেরা ৫শ' বিশ্ববিদ্যালেয়র মধ্যে। এক যুগ আগেও এশিয়ার সেরা ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। কিন্তু কলুষিত ও সহিংস ছাত্ররাজনীত, শিক্ষার মান, সেশনজট সব মিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার অবস্থান যেন ধরে রাখতে পারছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই শিক্ষায়তন হারতে জানে না; লড়তে জানে। জাতির প্রয়োজনে বুক পেতে লড়ে যায়। ২০০৭ সালে ২০ অগাস্ট জিমনেশিয়াম মাঠে সেনা-ছাত্র সংঘর্ষের পর ফুঁসে উঠে ছাত্র সমাজ। সারারাত ধরে চলে সংঘর্ষ। পরদিন সারাদেশে দাবনলের মত আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হয়। ছাত্রদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে মাঠে নামেন শিক্ষকরাও। অবিলম্বে জর"রি অবস্থা প্রত্যাহার ও নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীরা। সেদিন রাতে ক্যাম্পাস থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। বিজয়োল াস শুর" করে আন্দোলকারীরা।

২২ আগস্ট সব বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি করা হয়। সরকারি হঠকারী সিদ্ধান্ড়ের ফলে বিপাকে পড়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। ২৩ আগস্ট টিচার্স টাওয়ার থেকে রাতের আধারে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় শিক্ষক সমিতির তৎকালনি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক হার"ন-উর-রশিদকে। পরে গ্রেফতার করা হয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড.

সদর্ল আমিন, জগন্নাথ হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিককে। দুঃসহ সে ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করে ড. আনোয়ার হোসেন ও ড. হার্ন-উর-রশিদকে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন। এটা মনে করে দিচ্ছিল ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের কথা। পরবর্তী পর্যায়ে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ব্যানারে চলতে থাকে আন্দোলন। আসে সফলতা। কারাগারের শেকল ভেঙ্গে মুক্ত হয় সম্মানিত শিক্ষকরা। নানা কারণে বিগত কয়েক বছর শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। সেই দূরত্ব ঘুচিয়েই সবাই এখ একই বন্ধনে আবদ্ধ; সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য।

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান ও মেধাচর্চার সঙ্গে সমাজের প্রয়োজন, সামাজিক মূল্যবোধ সমন্বিত দায়িত্ব, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মুক্তচিন্ড়া নিশ্চিত করতে সামাজিক প্রত্যাশা এবং বহুত্ববাদী চেতনার উপস্থিতি ঘটায়। সময়ের বহুমুখী বিপুল দাবির প্রয়োজন পূরণ করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পদ ও আর্থিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নতুন সহস্রাব্দের টেকসই উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিশ্বায়ন ও সুশাসনের বিষয়কে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে – নির্মাণ করে যাবে আগামীর সুন্দর ভবিষ্যত এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্য সহায়তা

ড. মোহাম্মদ হাননান বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খ্ ১৯৫৩-১৯৬৯ (আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

রফিকুল ইসলাম, স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা "আমারে তুমি অশেষ করেছ", "স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" ও "সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়"।

বিভিন্ন সময়ের জার্নাল/পত্র-পত্রিকা।

লেখক: সাবেক সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও সাবেক ডীন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ।

বিভাগের আদ্যকথা: যেন ভুলে না যাই

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ। তারপর এর ভৌগোলিক অবয়ব এতটাই বদলে গেছে যে, যারা পঞ্চাশ বছর আগের রূপ দেখেছিলেন, তাদেরও অনেকে এখন আর তাদের দেখা অতীত রূপ পুরোপুরি মনে করতে পারেন না। ধরা যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই আমতলা ও বেলতলার কথা। বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জর্রি বর্হিবিভাগ (এমার্জেন্সি) যেখানে অবস্থিত, তার পাশে একটি বিশাল গেট রয়েছে। গেটটি এত বড় যে তাতে একটি পরিবারের থাকার মতো একটি বাড়িও রয়েছে। এ স্থানের পুরনো রূপ আমূল পাল্টে যাওয়ার পরও সৌভাগ্যক্রমে গেটটি এখনও রয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না। বিশাল দেয়াল তুলে গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই গেটই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার কলাভবনে ঢোকার একমাত্র পথ। সেই পথে ঢুকে বাঁয়ে বেলতলা ও ডানে আমতলা পেরিয়ে মাঝারি ধরনের মাঠ। সেই মাঠের বাঁ পাশে একটা টানা লম্বা পাকা দেয়ালের টিনের ঘর। দেখতে ছিল অনেকটা গ্রামের স্কুলঘরের মত। এখানে ছোট ক্লাশ র্ম এবং যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবত, গোটা কয়েক অফিসর্মও ছিল। সেটা পেরিয়ে, একটা লম্বা, অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার দোতলা দালান। মাঠের ডানে বিশাল গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে মূল কলাভবন। এই কলাভবন ছিল মূলত বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলের মূল ভবনের দক্ষিণ দিকের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ। তার পাশে ছিল রেললাইন, যা তখন তেজগাঁও রেলস্টেশনের সঙ্গে ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনকে সংযুক্ত করেছিল। এখন ফুলবাড়িয়া স্টেশন কিংবা রেললাইনের অস্ড়িত্ব নেই। রেললাইন এখন ব্যস্ড় সড়ক যা চানখাঁরপুল এলাকা থেকে নীলক্ষেত অতিক্রম করে কাঁটাবনের রাস্ড়ায় পরিণত হয়েছে। এই পুরনো রেললাইন ঘেঁষেই ছিল তখনকার কলাভবনের পাশের একটি অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার দোতলা দালান, যেটিতে বিভিন্ন বিভাগের অফিস এবং বিভাগীয় প্রধানদের বসার ঘর ছিল। এই দালানেরই দোতলার শেষ অংশে একটি খুবই ছোট ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাংবাদিকতা বিভাগ।

ঘরটিতে প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান আতিকুজ্জামান খান বসতেন এবং একই সঙ্গে সেটাই ছিল তাঁর অফিস ঘর। ঘরটা এতই ছোট ছিল যে, তখনকার বিভাগীয় প্রধানের বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা বসানোর পর তাতে তেমন কোন জায়গা থাকত না। টেবিলের দু'পাশে কয়েকটি চেয়ার রাখা গেলেও বিভাগীয় প্রধানের টেবিলের সামনে আর

কোন চেয়ার রাখার জায়গা ছিল না। কোনো চেয়ার সেখানে রাখলে অর্ধেকটা লাগোয়া দরজা পেরিয়ে সরু বারান্দায় রাখতে হতো। আমি যেহেতু প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলাম তাই সেখানেই আমাদের ভর্তি পরীক্ষার ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্ধেক ঘর আর অর্ধেক বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসেই আমাদের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

আগেই বলেছি সেটা ছিল ১৯৬২ সাল। আর আমি এই লেখাটি লিখছি ২০১৩ সালে। প্রথম কোর্স ছিল এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এলেও, যতদূর মনে পড়ে সম্ভবত ২ আগষ্ট আমাদের প্রথম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ছোট্ট ঘরে কোনোমতেই বিভাগের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। সম্ভবত সেসময়ই বিভাগীয় অফিসে একজন অফিস সহকারী ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও নিয়োগ দেওয়া হয়। বিভাগের স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা সমাধানে আমরা ছাত্র থাকতেই সেটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উল্টোদিকে, বর্তমান সায়েন্স অ্যানেক্স ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

সায়েন্স অ্যানেক্সের সম্ভবত তিনতলায় বিভাগীয় প্রধানের জন্য একটা বড় রুম বরাদ্দ করা হল। পাশে অফিস। এছাড়া বেশ ভালো মানের সংলগ্ন গোটা কয়েক ক্লাসরুমও ছিল। সন্ধ্যার পর ক্লাস হতো। ডিপ্লোমাতে মোট ১৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল। এরমধ্যে ছাত্রী ছিল মাত্র একজন – সেসময়ে কলা অনুষদের ডীন ও উর্দু বিভাগের প্রধান প্রফেসর সাদানীর মেয়ে, নিশাত সাদানী। সুদর্শনা নিশাত খুবই মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। আমাদের সঙ্গেই ডিপ্লোমাতে ভর্তি হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় প্রধান ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ক আ ই ম নুরউদ্দিন। তখন তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ইতিহাসের তরুণ শিক্ষক। স্বভাবে ও আচার-আচরণে ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বয়সে আমার চাইতে ছয় বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমার এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রয়াত এই অধ্যাপকের নামেই এখন বিভাগের মিডিয়া ল্যাবটির নামকরণ করা হয়েছে। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসায় প্রথম ডিপ্লোমা শ্রেণির আমার সকল সহপাঠির নাম এখন আর স্মরণ করতে পারছি না। তবে এটা মনে পড়ে যে, এদেশের সাংবাদিকতা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী এই শিক্ষার্থীরা নানা বয়সের ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য স্নাতকরা যেমন ছিলেন (এ লেখক তাদের একজন) তেমনি ছিলেন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বয়স্ক শিক্ষার্থীরা। তবে পুরোপুরি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত কেউ ছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। তখন এদেশের সাংবাদিকতা বা গণযোগাযোগ সংক্রান্ত পেশায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো মানুষের সংখ্যাও খুব কম ছিল। বিভাগীয় প্রধান আতিকুজ্জামান খানের সাংবাদিক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। সাংবাদিকতায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়েছিল, আমার জানা মতে, লন্ডন স্কুল অব জার্নালিজমে। এই বিভাগে যোগদানের পূর্বে তিনি তৎকালীন ওয়াপদার জনসংযোগ পরিচালক ছিলেন।

আমাদের সময়ে বা গোটা পাকিস্তান আমলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। সাংবাদিকতাও তাই ইংরেজি মাধ্যমেই পড়ানো হতো। আতিকুজ্জামান খান ইংরেজিতে খুব দক্ষ বক্তা ও লেখক ছিলেন। এ ছাড়া সমস্ত পাকিস্তানে তিনিই ছিলেন ইংরেজি ভাষায় টেস্ট ক্রিকেট খেলার একমাত্র বাঙালি ভাষ্যকার। তাঁর চমৎকার ইংরেজি ধারাভাষ্যের অনেক অংশ ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকের এখনও মনে আছে।

প্রথম ডিপ্লোমা ব্যাচের (১৯৬২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি তাদের মধ্যে ছিলেন, ক আ ই ম নুরুদ্দিন, শফিকুর রহমান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, নিশাত সাদানী, নুরুল আবেদীন প্রমুখ। আলভী নামে একজন অবাঙালি বয়স্ক ছাত্রও ছিল বলে মনে পড়ে। সম্ভবত ১৯৬৩ সালে কিংবা ১৯৬৪ সালের শুরুতে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলপ্রকাশের পর আমরা সেই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পুরনো ঢাকার নবাবপুর রোডে অবস্থিত একটি নামকরা স্টুডিওতে গিয়ে গ্রুপ ফটোও তুলেছিলাম। স্টুডিওটির নাম ছিল সম্ভবত 'ডাস'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় স্টুডিওটি পুড়ে যাওয়ায় আমরা আর সেখান থেকে ছবির কপি সংগ্রহ করতে পারিনি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আমাদের এমনকি আমাদের শিক্ষকদেরও খুব মর্মাহত করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আর ছবি তোলার উদ্যোগও নেওয়া সম্ভব হয়নি। খুব কম লোকেরই তখন ব্যক্তিগত ক্যামেরা ছিল। ছবি তোলার জন্য প্রধানত ফটোগ্রাফার নিয়োগ করাই ছিল প্রচলিত রীতি। আলোচ্য প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা কাপ্তাই-এ শিক্ষা সফরে গেলে সেখানেও সঙ্গে থাকা ফটোগ্রাফারই ছবি তুলেছিলেন। সেই সমস্ত ছবি তৎকালীন বিভাগীয় প্র্যাকটিস জার্নাল ভিসতাতে (VISTA) ছাপাও হয়েছিল। আমার জানা মতে, প্রথম ব্যাচের উদ্যোগে সম্ভবত আট পাতার এই সচিত্র পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তী বছরগুলোতেও পত্রিকাটির একাধিক ইস্যু প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই পত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য। যদি কারও কাছে পত্রিকাটির কোনো কপি থেকে থাকে, তবে তা এই বিভাগের প্রামাণ্য ইতিহাস লেখায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই এই পত্রিকার কপি কারও কাছে থাকলে অন্তত তার ফটোকপি বিভাগীয় অফিসে দেওয়ার জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে আবেদন জানাচ্ছি। আমার কাছে থাকা একটি কপি আমি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় হারিয়ে ফেলেছি।

প্রথম ব্যাচ থেকে যতদূর মনে পড়ে, আমি একাই পেশাদারী সাংবাদিকতায় এসেছিলাম। সেই ব্যাচেরই ছাত্র নুরউদ্দিন অবশ্য শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগদান করেন। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, তখন অবশ্য যেকোনো বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট হলেই সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়া যেত। প্রথম দিকের ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ব্যতিক্রম বাদে খুব কম শিক্ষার্থীই সরাসরি সাংবাদিকতায় যোগদান করেছেন।

ডিপে ামা অর্জনকারীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। এমনকি সামরিক অফিসারও এসেছিলেন সাংবাদিকতায় ডিপে ামা করতে। অন্য পেশার মানুষেরা প্রধানত শখের বশে ডিপে ামা করতে এলেও, পাশ করে যাওয়ার পর সাংবাদিকতা বিশেষ করে যোগাযোগ বিষয়ে জ্ঞানার্জন তাদের নিজ নিজ পেশায় দায়িত্ব পালনে খুবই সহায়ক হয়েছে বলে পরবর্তী সময়ে অনেকেই জানিয়েছেন।

এক বছরব্যাপী রাত্রিকালীন এই ডিপে ামা কোর্সে অনেক পেশাদার সাংবাদিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকেরা খ ন্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। বিভাগে ইংরেজি, বাংলা অথবা উর্দু অবশ্যপাঠ্য ছিল। যতদূর মনে পড়ে প্রথমদিকে খ ন্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন, সাংবাদিকদের মধ্যে সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ, মাহবুব জামাল জায়েদী, মাহবুব আলম চৌধুরী (বেবি ভাই হিসেবে পরিচিত) প্রমুখ এবং সেই সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক ড. আহমদ শরীফ, ইংরেজির শিক্ষক কে এম এ মুনিম এবং ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। প্রথমে পূর্ণকালীন একমাত্র শিক্ষক ছিলেন বিভাগীয় প্রধান আতিকুজ্জামান খান এবং পরে যোগ দেন বিভাগ থেকে সদ্য ডিপে ামাপ্রাপ্ত ক আ ই ম নুরউদ্দিন। ১৯৬৮ সালে ডিপে ামা কোর্সের সঙ্গে যোগ হয় সাংবাদিকতায় দুই বছর মেয়াদী এমএ কোর্স। এমএ কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক বছর মেয়াদী এমএ (প্রথম পর্ব) এবং এক বছর মেয়াদী এমএ (শেষ পর্ব)। যাদের ডিপে ামা করা ছিল তারা সরাসরি এমএতে (শেষ পর্ব) ভর্তি হতে পারত। ১৯৬৯ সালে ভর্তি হয়ে এমএ-এর (শেষ পর্ব) ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৭০ সালে পূর্ণাঙ্গ এমএ ডিগ্রি অর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে) তাঁরাই প্রথম সাংবাদিকতায় এমএ। ততদিনে পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে চাকরিরত থাকলেও আমিও এই প্রথম ব্যাচের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।

এরপর মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের গৌরবময় জন্ম। অনেক কিছুই পাল্টে যাচ্ছিল। বিভাগীয় প্রধান আতিকুজ্জামান খান একাত্তরে পাকিস্ড়ানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত হলে তিনি পদত্যাগ করেন। আতিকুজ্জামান ছাড়া তখন বিভাগে শিক্ষক ছিলেন মাত্র দু'জন। নুরউদ্দিন ও নূর ল হোসেন। সেটা ১৯৭২ সাল। আমি ১৯৭২ সালেরই আগস্ট মাসে বিভাগে যোগদান করি। এর আগে আমি একটি জাতীয় সাংবাদপত্রে কর্মরত ছিলাম। আমার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে চাকরিতে আমাকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এর কিছু দিন পরই নূর ল হোসেন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি, ফলে বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র দুইজনে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর বিভাগে অনেক পরিবর্তন আসে। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়। শিক্ষার্থীরা এই দুই ভাষার যেকোনো একটি মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পায়। ক্লাসর মেও শিক্ষকরা দু'টি ভাষাই ব্যবহার শুর করেন।

প্রশ্নপত্রও দুই ভাষায়ই প্রণীত হয়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনজন নতুন পূর্ণকালীন শিক্ষক বিভাগে যোগদান করেন। এঁরা হলেন মোশতাক ইলাহী, এস এম হার ন এবং ওয়াজির হোসাইন। অবশ্য কিছুদিন পর মোশতাক ইলাহী যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এরই মধ্যে ১৯৭৪ সালে তৌহিদুল আনোয়ার এবং কাজী আবদুল মান্নান শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগদান করেন। সিনিয়র শিক্ষক নুরউদ্দিনই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। বিভাগে তখন মোট শিক্ষকের সংখ্যা সাত-এ উন্নীত হলে শিক্ষকদের উপর চাপ অনেকটাই হ্রাস পায়। এর আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৩ জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স প্রতি তিন বছর অন্ড়র সিনিয়রিটি অনুযায়ী বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরিবর্তনের বিধান রাখা হয়। অবশ্য তাতে চেয়ারম্যান হতে হলে কমপক্ষে সহকারি অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকার শর্ত ছিল। মাঝখানে মূল অর্ডিন্যান্সের বিধি পাল্টে অল্প কিছুদিনের জন্য সহযোগী অধ্যাপকের পদমর্যাদার নিচে কাউকে চেয়ারম্যান না করার নিয়ম করা হলেও পুনরায় তা পরিবর্তন করে মূল অর্ডিন্যান্সের বিধিই বহাল রাখা হয়। এখনও পর্যন্ড় সেই নিয়মই চলছে।

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান পরিবর্তিত হয়। ১৯৭৭ সালে বিভাগের কোর্সে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। বিভাগে তিন বছর মেয়াদী বিএ (অনার্স) কোর্স চালু করা হয়। (১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে এই কোর্স চার বছর মেয়াদী হয়, যা এখনও চলছে) অনার্স কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক বছর মেয়াদী এমএ কোর্স নির্ধারিত হয়। সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য বিষয়ে গ্রাজুয়েটদের জন্য এমএ (প্রথম পর্ব) এবং এমএ (শেষ পর্ব) অর্থাৎ দু'বছর মেয়াদী এমএ কোর্সও চালু থাকে। এছাড়া অত্যন্ড় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ছিল এই যে, বিভাগ শুর হয়েছিল যে এক বছর মেয়াদী ডিপে ামা কোর্স দিয়ে তা বিলুপ্ত করা হয় এবং বিভাগের সকল একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম রাতের পরিবর্তে দিনে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া বিভাগটির নামের সঙ্গে 'গণযোগাযোগ' যুক্ত হয়ে বিভাগের নাম হয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। এক কথায়, বিভাগটি একটি পরিপূর্ণ বিভাগের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

এর কিছুদিন পর প্রথম পর্ব বা প্রিলিমিনারি এমএ কোর্স সমস্ড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উঠে গেলে কেবল অনার্সের শিক্ষার্থীদেরই মাস্টার্স করার সুযোগ থাকে। আমার জানামতে, ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা সাংবাদিকতায় বিএ (অনার্স) কোর্সটিই এই উপমহাদেশে এই বিষয়ে প্রথম অনার্স কোর্স। ঘটনাক্রমে আমিই এ সময় বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলাম বিধায় আমার জানা আছে যে, এই সমস্ড় ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিভাগের শিক্ষকদের কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এরপর থেকে ক্রমাগতভাবে বিভাগের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ অব্যাহত থেকে এটি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান বিভাগে পরিণত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে উলে খযোগ্য আরও একটি গুর"ত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই যে, বিভাগটিকে ২০০২ সালে কলা অনুষদের পরিবর্তে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়।

বিভাগে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন অধ্যাপক তৌহিদুল আনোয়ার ও অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন। বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রয়াত হয়েছেন অধ্যাপক ক আ ই ম নুরউদ্দিন। এছাড়া প্রয়াত হয়েছেন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক পরবর্তী সময়ে মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব আশফাক মুনীর (মিশুক) এবং প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধান আতিকুজ্জামান খান। নানা সময়ে বিভাগের কিছু সংখ্যক শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে-বিদেশে অবস্থান করছেন।

বর্তমানে বিভাগে পূর্ণকালীন শিক্ষকের সংখ্যা ২৩। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ড় ১১ জন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের মধ্যে তিনজন একাধিকবার চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে ছিলেন। বিভাগ থেকে এ পর্যন্ড় ছয় জন পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়েছেন। কয়েকজন পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন। বর্তমানে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১৮। ছাত্রের সংখ্যা ২৩০ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৮৮। নিয়মিত অনার্স ও এমএসএস কোর্স ছাড়াও বিভাগে নরওয়েজীয় অর্থসাহায্যে রিজিওনাল মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছিল যা চার বছর চলার পর, আপাতত বন্ধ রয়েছে। বিভাগে খ"কালীন শিক্ষকের সংখ্যা ৯। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১২। বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সক্রিয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে উলে খযোগ্য যে, বিভাগ থেকে পাশ করে যাওয়া বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বর্তমানে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে কর্মরত রয়েছে। বিভাগে শিক্ষার্থী থাকাকালীনও অনেকে খ"কালীন কাজ করছে গণমাধ্যমগুলোতে। উলে খযোগ্যসংখ্যক ছাত্রীও যেমন পাশ করে মিডিয়াতে যোগ দিয়েছে, তেমনি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ইতোমধ্যেই গণমাধ্যমের নীতি নির্ধারক পর্যায়েও স্থান করে নিয়েছে।

অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বিভাগের ভাবমূর্তি এখন বেশ উজ্জ্বল। তবে সীমাবদ্ধতাও আছে এবং সেগুলো কাটিয়ে সাংবাদিকতা তথা গণযোগাযোগ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই অগ্রণী বা পাইওনিয়র প্রতিষ্ঠানটি দেশসেবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক।

সাংবাদিকতা শিক্ষা ও পেশা: ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

ফাহমিদুল হক

সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ৪০ বছর অতিক্রম করেছে, আর সাংবাদিকতা শিক্ষা অতিক্রম করেছে ৫০ বছর। সাংবাদিকতার শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুর" হয় ১৯৬২ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অর্ধশত বছর পূর্তির এই সময়টি সাংবাদিকতা শিক্ষা, সাংবাদিকতার চর্চার মূল্যায়ন এবং নিকট ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেয়ার চমৎকার উপলক্ষ।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ধরন গত দুই দশকে পাল্টেছে। রাজনীতিবিদদের হাত দিয়ে আদর্শিক অবস্থান থেকে যে সাংবাদিকতা শুর" হয়েছিল তার খুব কমই অবশিষ্ট রয়েছে। এখন ব্যবসায়িক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকতায় বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আদর্শিক সাংবাদিকতার পরিবর্তে হাজির হয়েছে পেশাদারি সাংবাদিকতা। দেশে এখন মুদ্রণ, সম্প্রচার, অনলাইন – নানামুখী সাংবাদিকতা বিস্ড়ার লাভ করেছে। সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই। ক্রমবর্ধমান মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির এখন একটা গুর"তর সমস্যা হলো পেশাদার ও দক্ষ সাংবাদিকের সঙ্কট। আজ পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রায় সমপরিমাণ বিভাগ রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় এই বিভাগগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু পেশাদারিত্বের সঙ্কট তার পরও কাটেনি।

একসময় সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন কেউ অনুভব করতো না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, মুদ্রণের পাশাপাশি বেতার ও টেলিভিশনে এবং অনলাইনে সাংবাদিকতার পরিধি বিস্ড়ৃত হয়েছে। এইসব নতুন ধরনের সাংবাদিকতায় টেকনিক্যাল ও প্রাযুক্তিক জ্ঞান দরকার যা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা শিক্ষা গ্রহণ না করে যারা সাংবাদিকতা করতে চান, তাদের জন্য তাই প্রশিক্ষণ খুব জর"রি। এছাড়া রয়েছে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রতিনিধিরা, যাদের জন্য প্রশিক্ষণ ছাড়া গত্যন্ড়র নাই। সংবাদ লেখার কলাকৌশল ছাড়াও সাংবাদিকতার রয়েছে একটি নৈতিক দিক যা তাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়ন করা জর"রি।

এক স্থানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, সাংবাদিকতা বিভাগগুলো প্রয়োজনের তুলনায় জনশক্তি সরবরাহ করতে পারছে না, আবার যে জনশক্তি তারা সরবরাহ করছে তাদের

তত্ত্বীয় জ্ঞানের তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞান কম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য অন্য কাজও রয়েছে। সাংবাদিকতার হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করাও তার কর্মপরিধির মধ্যে অন্যতম বিষয়। ফলে ঠিক যেরকম জনশক্তি ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন তার ঘাটতিটুকু ইন্ডাস্ট্রিকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়ায় নি। আজ প্রয়োজন পড়েছে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিত উদ্যোগে নিজেরাই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে তুলবে, যার মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তে যেধরনের মানবসম্পদ প্রয়োজন তা তৈরি করা সম্ভব হবে। বিদেশে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে তোলা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো কার্যকরভাবে এই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি তাই গুর"ত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষা কার্যক্রম শুর" হয় আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম অনুকরণে। ফলে এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হলো ইন্ডাস্ট্রিতে মানবসম্পদ সরবরাহ। তাই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য-বিধেয়কে ক্রিটিকালি মোকাবিলা না করার ঝোঁক বিশেষত প্রথম দিকের সিলেবাসে লক্ষ্যণীয় ছিল। কিন্তু ইদানীংকার কিছু কিছু কোর্সের শিরোনাম বা আধেয় দেখে মনে হয় বাজারে মানবসম্পদ সরবরাহ করাই এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি বা রাজনীতির সঙ্গে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যমের সম্পর্ক কী, তাও পাঠক্রম অধ্যয়ন করতে চায়। কিন্তু এই দুই দিকই স্পর্শ করতে গিয়ে সিলেবাসে এক ধরনের দ্বিধা এমনকি স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। গণমাধ্যম ইন্ডাস্ট্রির জন্য মানবসম্পদ উৎপাদন করা এবং সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী তা ক্রিটিক্যাল অধ্যয়নের মাধ্যমে বিশে ষণ-গবেষণা করা – মিডিয়া অধ্যয়নের সিলেবাসে এই দুই দিকেই ঝোঁক রয়েছে।

ব্যবহারিক সাংবাদিকতার বিভিন্ন পর্যায়

পৃথিবীর নানা দেশের মতো বাংলাদেশেরও সাংবাদিকতার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সাংবাদিকতা প্রবর্তিত হয়েছে রাজনীতিবিদদের হাতে, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্ড় বায়নের হাতিয়ার হিসেবে গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে সাংবাদিকতার বিস্ড়ারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পক্ষে কথা বলা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রবর্তনের পেছনে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা বিভাগগুলোর অবদান রয়েছে। এরপর এখন চলছে কর্পোরেট মালিকানার সাংবাদিকতা। এই বাস্ড়বতা যেমন বৈশ্বিক, তেমনি স্থানীয়। এই তিন পর্যায়ে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য ও রীতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পাকিস্ড়ান আমলে প্রতিষ্ঠিত দৈনিক *ইত্তেফাক* এবং দৈনিক *সংবাদ* এখনও প্রথম পর্যায়ের সাংবাদিকতার শেষ প্রতিনিধি হিসেবে টিকে আছে। পাকিস্ড়ান আমলের স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই দুটি পত্রিকার ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার ছাড়াও বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ঐতিহাসিক নানা ঘটনাক্রমের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িয়ে পড়েছে। বাকি প্রায় সব মুদ্রণ ও সম্প্রচার মাধ্যমের জন্ম হয়েছে বিগত দুই দশকে। লক্ষ করার বিষয়, সমাজতান্ত্রিক

বিশ্বের পতনের পর, এই দুই দশক হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিনির্ভর বিশ্বায়নের কাল। ফলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটা প্রভাব এই সময়ের গণমাধ্যমের ওপরে পড়েছে, উল্টো দিক থেকে সম্প্রসারণশীল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াসৃষ্ট পুঁজিতান্ত্রিক কর্মকা ের অন্যতম অংশীদার হিসেবে থেকেছে গণমাধ্যম। বিদ্যমান গণমাধ্যম পরিস্থিতি তাই, একইসঙ্গে, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের কারণ ও ফলাফল।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতার (বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা) বিস্ড়ৃতি ছিল স্বল্পকালের, অন্য দেশের সঙ্গে পার্থক্যটা এইখানে। দেশ স্বাধীন হবার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার প্রয়োজন একরকম ফুরালেও, আশির দশক পর্যন্ড় আমরা রাজনৈতিক সাংবাদিকতাকেই দেখেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতার (বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা) প্রতিনিধি হিসেবে আমরা নব্বই দশকের মাঝামাঝি পেয়েছি *আজকের কাগজ*কে। সাংবাদিকতা বিভাগে অহরহ উচ্চারিত বস্তুনিষ্ঠতার বাণীর একরকম প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ঐ পত্রিকায়। ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের একজন গ্র্যাজুয়েট। *আজকের কাগজ* পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি র"চিশীলতা, সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় দেয় পত্রিকাটি। কম্পিউটার ডেস্কটপ প্রকাশনা ও অফসেট মুদ্রণ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে চলে আসায় মুদ্রণমানেও পরিবর্তন আনতে পারে পত্রিকাটি। গুর"ত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন আসে দৈনিক পত্রিকায় লেখক ও পাঠকের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। নির্ধারিত উপ-সম্পাদকীয় লেখকের বাইরে মধ্যপাতায় চিন্ড়ক, বুদ্ধিজীবী মায় পাঠক পর্যন্ড় লেখা শুর" করেন নিজ পরিচয় বিবৃত করার মাধ্যমে। এরা সবাই হয়ে ওঠেন কলামিস্ট, এবং দ্র"ত মধ্যপাতানির্ভর একটি সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠতে থাকে বাংলাদেশে। *আজকের কাগজ*-এর নতুনত্ব *ভোরের কাগজ* আবির্ভাবের মাধ্যমে স্থানান্ড়রিত হয় এবং *প্রথম আলো* পত্রিকার আবির্ভাবের পরে ক্ষণস্থায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতার অবসান ঘটে।

*প্রথম আলো*র মাধ্যমেই কর্পোরেট সাংবাদিকতার প্রবর্তন ঘটে, যদিও *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক-সাংবাদিকরা মিলেই পত্রিকাটি চালু করেন। কিন্তু মালিকানার প্রকৃতির কারণেই একই সম্পাদক-সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা থেকে সরে এসে কর্পোরেট সাংবাদিকতা শুর" করেন। আমদানিকারক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম গ্র"পের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান *প্রথম আলো*র পাশাপাশি, এস এম আলী প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি দৈনিক *দি ডেইলি স্টার*ও ট্রান্সকম গ্র"পের অঙ্গীভূত হয়। নব্বই দশকের শেষের দিকে *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার*-এর যূথবদ্ধতার আগেও কর্পোরেট সাংবাদিকতার নিদর্শন নিয়ে *জনকণ্ঠ* বা মুক্তকণ্ঠ হাজির হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রভাববিস্ড়ারকারী হয়নি। *প্রথম আলো*র নির্দিষ্ট করে দেয়া সাংবাদিকতার ধরন-ধারণই বাকিরা এখন পর্যন্ড় অনুসরণ করে চলেছে। প্রশ্ন হলো সেই ধরনটা কী?

সেই উত্তর দেবার আগে বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমির একটা বর্ণনা দেয়া দরকার। সমাজতন্ত্র পতনপরবর্তী মুক্তবাজার অর্থনীতিনির্ভর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশে এরশাদ-সরকারের স্বৈরাচারী শাসনাবসানপরবর্তী গণতন্ত্রের আবির্ভাব একই সময়ে ঘটে। এখন বাংলাদেশের এই নির্বাচনকেন্দ্রিক, অবিকশিত গণতন্ত্র মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য কোনোভাবেই প্রতিকূল ছিলনা। বরং পশ্চিমা দ্বিদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আদলে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবযুক্ত

মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। বলাবাহুল্য এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশ আছে গ্রাহক-প্রান্তে। বিশ্বায়নের কালে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশগুলো অক্রিয় ভোক্তার বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। সস্তাশ্রমনির্ভর তৈরীপোশাক শিল্প এবং বিদেশী বিনিয়োগনির্ভর টেলিকম খাত ছাড়া বাংলাদেশে বিদেশের পণ্য দেশে এনে বিক্রিভিত্তিক একটি সওদাগর-শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, এবং এই তিন খাতই বিকাশমান কর্পোরেট শ্রেণীর অংশীদার। ফলে ১৫ কোটি মানুষের একটি দেশ মানে সম্ভাব্য ১৫ কোটি ভোক্তার বাজার। আমদানিকারকদের দিক থেকে তাই প্রয়োজন পড়ে মানুষকে ভোক্তায় রূপান্তরের এবং ভোক্তসংস্কৃতি চালু করা বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম জরুরি শর্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

এই ভোক্তসংস্কৃতি চালু করার দায়িত্ব পড়ে গণমাধ্যমের ওপর। ফলে ট্রান্সকমের মতো আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠা করে *প্রথম আলো*র মতো সংবাদপত্রের যার মূল কর্মসূচি হলো নিজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণ করা, সার্বিকভাবে প্রাইভেট সেক্টর বা ব্যবসায় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা এবং পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ, বাজারের খবর, নতুন পণ্যের সংবাদ ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে ক্রয়মনস্কতার স্বভাব সৃষ্টি করা। বাজার সৃষ্টি ও ভোক্তাসংস্কৃতি চালু করার পাশাপাশি *প্রথম আলো*র মতো পত্রিকাগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যের সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান অপরিচ্ছন্ন কর্মকাণ্ড কে দায়ী করে। তাই পাল্টা শক্তি হিসেবে ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে সিভিল-সমাজ দাঁড় করিয়ে ব্যবসার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার মতো 'স্থিতিশীলতা', 'গণতন্ত্র' ও 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করাই এই গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই প্রয়োজনে এই *প্রথম আলো* ও *ডেইলি স্টার* পত্রিকা সেনা-সমর্থিত ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছে। কীরকম বাংলাদেশ তারা দেখতে চায় সেবিষয়ে সিভিলসমাজ-কর্পোরেট-মিডিয়া-মিলিটারির ঐক্য আছে। সব প্রতিষ্ঠানের বিরাজনীতিকরণের মাধ্যমে নির্বিবাদী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারার একটা পরিবেশ চায় এই ঐক্যজোট। এই বিরাজনীতিকরণ ডিসকোর্সের প্রবর্তন ও নিয়মিত চর্চার মূল দায়িত্ব গণমাধ্যমের হাতেই।

শূন্য দশকে টেলিভিশন চ্যানেলের 'বুম' উল্লেখ করার মতো আরেকটি ঘটনা। *ইটিভি*র মাধ্যমে টিভি চ্যানেলগুলোর একটি প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে যায় – বিশেষত সংবাদপরিবেশনে, অনুষ্ঠাননির্বাচনে, এবং গ্রাফিকাল উপস্থাপনায়। বর্তমানে ২৪টি বেসরকারি চ্যানেল সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব চ্যানেলগুলো *ইটিভি*র ফরম্যাটই অনুসরণ করে চলেছে। তবে *চ্যানেল আই*, *এনটিভি*, *এটিএন*সহ সব চ্যানেলই উল্লিখিত কর্পোরেট সাংবাদিকতার আওতায় রয়েছে। পুরোপুরি বিজ্ঞাপননির্ভর এই চ্যানেলগুলো কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং করতে গিয়ে সংবাদের সব স্লট বিক্রি করে দিয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার কাছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপনের বাজার ধরতে প্রতিযোগিতারত চ্যানেলগুলো সংবাদের স্লটগুলোকে অতি সস্তা করে তুলেছে। *প্রথম আলো*র সৃষ্টি করা কর্পোরেট সাংবাদিকতা চ্যানেলগুলোকে সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করেছে। *প্রথম আলো* যদি 'বদলে যাও বদলে দাও' কর্মসূচির মাধ্যমে কর্পোরেট সাংবাদিকতার গ ানি ঘোচাতে চায়, চ্যানেলগুলোর মধ্যে সেই চেষ্টাও নেই। তবে এটা ঠিক, টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ দেখা অধুনা মধ্যবিত্তের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যে-

অভ্যাস তৈরী হয়েছে বিগত এক দশকে। *বিটিভি*র সরকারনিয়ন্ত্রিত সংবাদ দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্তকে সংবাদ-বুভুক্ষু করে রেখেছিল। তবে সরকারগুলো মুদ্রণমাধ্যমকে স্বাধীন রেখে দিলেও, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে এখনও নজরদারির মধ্যে রেখেছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে *ইটিভি*, *সিএসবি* ও *চ্যানেল ওয়ান*কে। যারা টিকে আছে, তাদের সংবাদপরিবেশনে তাই কোনো ধার বা বলিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়না।

এফ এম চ্যানেল আরেকটি প্রপঞ্চ হিসেবে শূন্য দশকে হাজির হয়েছে। চারটি এফএম চ্যানেল এই মুহূর্তে চালু রয়েছে। এফ এম রেডিও মূলত পপ সঙ্গীতনির্ভর, এদের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তরুণরা, এবং সেইসব তরুণ যারা ইতোমধ্যে কর্পোরেট সংস্কৃতির অধিভুক্ত বা ঐ সংস্কৃতিতে নিজেকে নিযুক্ত করতে উন্মুখ রয়েছে। ফলে খানিক ইংরেজির মিশেলে এবং ইংরেজি-ঘেঁষা বাংলা উচ্চারণে যে-চ্যানেলগুলো চলছে তাতে রয়েছে ঘণ্টাপ্রতি খবর, আছে ঢাকা শহরের ট্রাফিক আপডেট, আছে শেয়ার বাজারের আপডেট। অল্প কিছু টকশো বা সাক্ষাৎকার বাদে বাকিটা মিউজিক। এফএম চ্যানেলগুলোর জন্মই কর্পোরেট-সংস্কৃতির আওতায়। অন্য মাধ্যমগুলো এক দশক ধরে একটি কর্পোরেট-সংস্কৃতি সৃষ্টির যে-চেষ্টা চালিয়েছে, এফএম চ্যানেলগুলো সেই সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়েই ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কর্পোরেটারয়নের বিপরীতে চালু হয়েছে কমিউনিটি রেডিও। কমিউনিটির মানুষদের উন্নয়নে, উন্নয়ন যোগাযোগের কাজ করবে এই কমিউনিটি রেডিও। তবে এর মালিকানা বা প্রচারস্বত্ব কেবল এনজিওগুলোই পেয়েছে। ফলে সম্ভাবনাময় ও বিকল্প এই মাধ্যমটি বিদ্যমান উন্নয়ন ডিসকোর্সের বাইরে এসে কমিউনিটিতে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে, সে-সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এনজিও উদ্ভাবিত এবং *প্রথম আলো-ডেইলি স্টার* সমর্থিত তথ্য অধিকার আইনের প্রচলনও শূন্য দশকের শেষের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে তথ্য অধিকার আইন চেয়েছে কমিউনিটির মানুষ, কিন্তু বাংলাদেশে এটি চেয়েছে বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওগোষ্ঠী, যারা কমিউনিটির উন্নয়নকল্পে কাজ করে থাকে। এরপরও বলা যায় কমিউনিটি রেডিও এবং তথ্য অধিকার আইন এই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আগামীর পূর্বাভাস

আগামী দশ বছর পর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স অর্ধশত পেরিয়ে যাবে। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের মিডিয়া খাতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। তাই আগামী দশ বছরে কী পরিবর্তন আসবে, তার পূর্বাভাস দেয়া বেশ কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, বিগত দশকের মতো নাটকীয় পরিবর্তন আসবে না। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশ থেকেই আলাদা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেক্ষেত্রে সাইবারপরিসরের কারণে সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে এখনও নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিও এখন সম্প্রসারণশীল। আর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ইন্টারনেটের এদেশে ব্যবহার এখনও অনেক কম। ফলে শুধু টিভি চ্যানেল বা এফ এম চ্যানেলই নয়, এদেশে এমনকি মুদ্রণ মাধ্যমের পরিধি এখনও বিস্তৃত হয়ে চলেছে। বলা দরকার, এখনও এদেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী মুদ্রণ মাধ্যমই।

তবুও আগামী এক দশকে যে পরিবর্তন আসবে, তা বিগত এক দশকের মতো পালাবদলের হবেনা। যেহেতু বিজ্ঞাপনের বাজার এতগুলো চ্যানেলকে সমর্থন দিতে পারে না, তাই কিছু চ্যানেল হয় বন্ধ হয়ে যাবে বা আদৌ আত্মপ্রকাশ করবে না। তবে আরও কয়েকটি এফএম চ্যানেল হয়তো আগামী দশ বছরে চালু হবে। আগামী দশ বছরে নতুন আরও ১০টি দৈনিক চালু হতে পারে। তবে আগামী এক দশকে গণমাধ্যম পরিস্থিতি বেশ সংহত অবস্থায় চলে আসবে। দশ বছরের মধ্যে সম্প্রসারণশীল গণমাধ্যম এক জায়গায় থিতু হবে এবং মুখোমুখি হবে নতুন চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ আসবে সাইবারপরিসর থেকে। অধিক পরিমাণ মানুষ ওয়েবে যুক্ত হবেন, এবং এরা হবেন সক্রিয় নেটিজেন। বিগত পাঁচ বছরে একটি বাংলা ব গ কমিউনিটি ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে যারা সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুকেও যুক্ত আছেন প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ। এদের হাত দিয়েই শুর" হতে যাচ্ছে অপেশাদার কিন্তু গুর"ত্বপূর্ণ সিটিজেন জার্নালিজম। এরাই সনাতন ও মূলধারার সাংবাদিকতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। বাধ্য হয়ে সনাতন মাধ্যম ওয়েবে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। কিন্তু যেহেতু তারা সমাজের অপরাপর ক্ষমতাধর শ্রেণীর সঙ্গে একটি মিথোজীবীমূলক সম্পর্কে লিপ্ত থাকে, তাই স্বাধীন সিটিজেন সাংবাদিকদের স্বতঃস্ফূর্ততা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকবে। ফলে ওয়েবে পেশাদার ও অপেশাদার বা বিকল্প সাংবাদিকতার একটি দ্বন্দ্বের দেখা পেতে পারি আমরা, আগামী দশকে।

ফাহমিদুল হক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর: পেশাদারির সংকট ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

পুরনো একটি গল্প এখনও প্রায়ই শোনা যায় – এক পুর"ষ সাংবাদিক একবার মনস্থির করলেন বিয়ে করবেন। সেই সাংবাদিকের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কোমরে গামছা বেঁধে পাত্রী নির্বাচনে নেমে পড়েন। পাত্রীর মুখদর্শনে গেলে পাত্রীর বাবা প্রশ্ন করে বসেন – ছেলে কী করেন, অর্থাৎ পেশা কী? ছেলেপক্ষের উত্তর – 'ছেলে নাম করা পত্রিকার সাংবাদিক'। মেয়ের বাবার পাল্টা প্রশ্ন – 'বুঝলাম সাংবাদিক, কিন্তু কী চাকরি করে'?

সাংবাদিকতা পেশাকে নিয়ে এমন অনেক নেতিবাচক গল্প প্রচলিত ছিল। এক সময় বলা হতো, যার হয় না অন্য কোনো গতি, তিনি হন সাংবাদিক। কিন্তু এখন যুগ পাল্টে গেছে, বর্তমান 'মিডিয়া বুম' বা বিস্ফোরণ-এর যুগে এমন গল্পগুলো এখন মিথ। যুগ শুধু পাল্টায়নি, অনেকখানি পাল্টেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিপরীত চিত্রও বলা যায়। মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর কোনো পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক হওয়ার জন্য তখনকার সিনিয়র সাংবাদিকদের কাছে রীতিমত পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তখন টেলিভিশন চ্যানেল হয়নি, পত্রিকার সংখ্যাও ছিল কম। এখন দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি সাথে যোগ হয়েছে টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইন পত্রিকা। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়েই সাংবাদিকতার চাকরি জুটে যাচ্ছে বেশ অনায়াসেই। এখন আমাদের দেশে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা বিশেষত টিভি সাংবাদিকতা শুধু জনপ্রিয়তাই পায়নি, এর বাজারও বিস্ড়ত হয়েছে। আগে টানা চার-পাঁচ বছর খুব ভালো মানের রিপোর্টিং করলে অন্য পত্রিকা থেকে ডাক পড়তো। কিন্তু আজকের শিক্ষানবিশ টিভি প্রতিবেদক কাল অন্য টেলিভিশনে যোগ দিচ্ছেন চড়া দামে, বেতনে। অনেক পত্রিকার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটছে। এ যেন শেয়ারবাজারের সুবর্ণ সময়ের উর্ধ্বগতিকেও হার মানায়। তবে এ লম্ফ-ঝম্ফ যে ক্যারিয়ারের জন্য কতটা হুমকিস্বরূপ তা ইতোমধ্যে অনেক ভুক্তভোগী সাংবাদিক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। হঠাৎ করে কোনো টিভি চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেলে চার-পাঁচশ সাংবাদিকের ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে একথা সত্যি যে,

সংকট বা সমস্যার কথা যতই বলা হোক না কেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার জগতে সম্ভাবনার ক্ষেত্র এখন আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। আগে যাকে পেশা হিসেবে অনেকেই মানতে চাইতো না এখন সে বাস্ড়বতা নেই; এখন সাংবাদিকতা একটি শুধু মহৎ নয় অর্থনৈতিক এবং পেশাগত দিক থেকে সম্মানজনক পেশাও বটে।

সাংবাদিকতা গণযোগাযোগের একটি শাখা। আমাদের দেশে গত দুই-আড়াই দশকে এ পেশার ধরন-ধারণ অনেকখানি পাল্টে গেছে। সাংবাদিকতা, গণযোগাযোগ কিংবা গণমাধ্যম শুধু যে একটি পেশা তা নয়, বরং এগুলো প্রযুক্তিনির্ভর পেশা এবং শাস্ত্রও বটে। চিকিৎসা, শিক্ষকতার মতো সাংবাদিকতাকেও মহান পেশা হিসেবে আমরা আখ্যায়িত করে থাকি। কারণ এ পেশাগুলোর মূল লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ বা উপকার করা। সেবাই এটির মূল ধর্ম। মানব সভ্যতায় সব পেশারই গুর"ত্ব রয়েছে। সব পেশাতেই 'সেবা'-কে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়। তারপরও কিছু কিছু পেশা আছে যেখানে আর্থিক লেনদেনের চেয়ে সেবাটাই মূল পদবাচ্য। চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভুল হলে রোগী মারা যেতে পারে, শিক্ষকতায় ভুল হলে শিক্ষার্থীর জীবন ধ্বংস হতে পারে, তেমনি সাংবাদিক ভুল করলে পুরো সমাজ ও জাতি বিভ্রান্ড় হতে পারে কিংবা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা শিক্ষকতার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে সেটা এখন আর লিখে জাহির করার কোনো বিষয় নয়। একটা সময়ে বলা হতো, সাংবাদিকতা করার জন্য এ বিষয়ে ডিগ্রির কোনো দরকার নেই। এ প্রশ্ন এখন আর ঘুরেফিরে আসে না। কারণ এখন প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকতার ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেন, বিশেষ করে শিক্ষানবিশ সাংবাদিক নিয়োগের ক্ষেত্রে। সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক ডিগ্রির আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা – এ প্রশ্ন বা বিতর্ক যে আমাদের দেশেই প্রথম উদয় হয়েছিল তা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। এ বিতর্ক শতাব্দীকালের চেয়ে ঢের বেশি পুরনো। ১৮৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোসেফ পুলিৎজার যখন প্রথম সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে যান তখনই তিনি সাংবাদিক ও অ্যাকাডেমিক প"িতদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হন। ওইসব প"িত ও সাংবাদিকদের বোঝাতে যোসেফ পুলিৎজারের দশ বছর সময় লেগেছিল। সাংবাদিকতা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে নর্থ আমেরিকান রিভিউ-এর ১৯০৪ সালের মে মাসের সংখ্যায় যোসেফ পুলিৎজার লিখেছিলেন, 'সাংবাদিকতাকে একটি শিক্ষিত ও মার্জিত' এবং 'সাংবাদিকদের মধ্যে আভিজাত্যবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ' জাগরণে তিনি এ বিভাগ খোলার চেষ্টার করেছিলেন। শত বছর আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ওই শতক শেষ হওয়ার আগেই আইন কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতো সাংবাদিকতা বিশ্বব্যাপী একটি গুর"ত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে পঠিত ও চর্চিত হবে।' শুধু আমেরিকা নয়, বাংলাদেশের দিকে তাকালেও তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নেই এমন কাউকে আর

আজকাল চাকরি দিতে চান না। তবে সাংবাদিকতা শাস্ত্রে ডিগ্রিপ্রাপ্ত নন এমন অনেক ভালো সাংবাদিক এদেশে আছেন। কিন্তু তাদের বিষয়ে খোঁজ নিলে জানা যাবে, তারা পরিপক্ব ও শাণিত হয়েছেন সাংবাদিকতা বিষয়ে এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ পেয়ে, শুধু কর্মক্ষেত্রে ঠেকে শিখে নয়।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার পথচলা শুর" হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ সালের ২ আগস্টে। মাত্র ১৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলা অনুষদে যাত্রা শুর" করে এ দেশে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানকারী প্রথম বিভাগ সাংবাদিকতা বিভাগ। সে হিসেবে ২০১২ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর বা সুবর্ণজয়ন্ড়ী পূর্ণ হলো। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা যেমন অর্জন করেছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার কদর, চাহিদার প্রসার বেড়ে চলেছে। দেশে এখন ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, বেগম রোকেয়া) ও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার উপর ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশন ও ফিল্ম স্টাডিজ নামে নতুন বিভাগ চালু হয়েছে। গড়ে বছরে প্রায় ৫০০-৬০০ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে পেশায় প্রবেশ করছে, যাদের বেশিরভাগই যুক্ত হচ্ছেন সাংবাদিকতায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করছে। কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার আগেই কর্মপরিবেশকে বুঝতে পারছে।

পেশাগত সম্পৃক্ততা বাড়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে প্রায়োগিক নানা কোর্সের সংযোজন ঘটিয়ে শিক্ষাকে কর্মমুখী ও বাস্ড়বভিত্তিক করা হচ্ছে। এদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার শুর"র দিকে শুধু সাধারণ রিপোর্টিং ও সম্পাদনা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। এখন উচ্চতর রিপোর্টিং ও সম্পাদনার পাশাপাশি বিটভিত্তিক সাংবাদিকতা বিশেষ করে ব্যবসায় সাংবাদিকতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, অনলাইন/সাইবার সাংবাদিকতা, সম্প্রচার সাংবাদিকতা, রেডিও সাংবাদিকতা, ভিডিও যোগাযোগ, ফটো সাংবাদিকতা, পরিবেশ সাংবাদিকতা, সায়েন্স রিপোর্টিং, কোর্ট রিপোর্টিংয়ের মতো অনেক বিশেষায়িত রিপোর্টিং কোর্সের সংযোজন করা হয়েছে। সময়ে সময়ে এসব কোর্সের আধেয় পরিবর্তন করা হচ্ছে, করা হচ্ছে যুগোপযোগী। আগের তুলনায় এসব কোর্স এখন অনেক বেশি ব্যবহারিক কোর্সনির্ভর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আজকাল বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করছে। সংবাদমাধ্যমগুলো আগের তুলনায় এখন সংবাদকর্মীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুর"ত্ব দেয়। আবার বর্ধনশীল টেলিভিশন ও রেডিও বাজারকে লক্ষ্য করে রাতারাতি অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান নিয়ে বিশেষ করে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার আধেয়, উপকরণ এবং শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। কোনো ধরনের নিয়ম-নীতি ও পর্যবেক্ষণ না থাকায় এগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিছু 'স্টার'-এর পোস্টার সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে সম্প্রচার সাংবাদিক হতে ইচ্ছুক তর"ণ-তর"ণীদের পকেট কাটছেন অনায়াসেই।

সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার বিভাগের মধ্যে বিস্ড়র ফারাক আছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সবখানেই এমন ফারাক থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ব্যবসা করার মধ্য দিয়ে সাংবাদিক তৈরি করা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগগুলোর মূল লক্ষ্য সুনাগরিক তৈরি করা যাদের কেউ কেউ সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। দেশের সবগুলো পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পাশ করার অর্থ এই নয় যে শুধু শিক্ষার্থীকে সাংবাদিকতা করতে হবে। আগেই বলেছি, সাংবাদিকতা গণযোগাযোগের একটি শাখামাত্র। তাই গণযোগাযোগের অন্য শাখাকেও পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ থাকে এই বিভাগগুলো থেকে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো বিভাগের লক্ষ্য থাকে তার শিক্ষার্থীরা মুক্ত মনের বা মুক্ত চিন্ড়ার মানুষ হবেন। এই মানুষ সমাজের নানা দিক ও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, ক্রিটিক্যালি সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করবেন। এ নাগরিকদের স্বপ্ন সমাজের পরিবর্তন ঘটানো। জনগণের ভালো হয় এমন পরিবর্তনের জন্য তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। এ নাগরিকরা তাদের অঙ্গীকার পূরণে সাংবাদিকতাকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন বা করতে পারেন। এমন নাগরিক তৈরি করাই একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন আদর্শ বিভাগের লক্ষ্য। কিন্তু কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এমন লক্ষ্য থাকে না। তাছাড়া শিক্ষার সময়সীমা ও আঙ্গিকের দিক থেকেও দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

সাংবাদিকতা এখন আর শুধুই একটি পেশা নয়, প্রযুক্তিনির্ভর পেশা বা শাস্ত্র। শিক্ষাকে বাস্ড়বভিত্তিক, যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করতে এ পেশা ও শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েই হতে হয়। কিন্তু একটি প্রযুক্তিনির্ভর পেশা বা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য যে পরিমাণ প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার তা কোনোভাবেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ পুরোপুরিভাবে এখনও পর্যন্ড় নিশ্চিত করতে পারেনি। সবচেয়ে পুরাতন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগটির কম্পিউটার ল্যাব, মিডিয়া ল্যাব, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি ল্যাব, নিজস্ব ভিডিও ক্যামেরা, ভিডিও প্যানেল থাকলেও এখনও কোনো প্রকাশনা নেই, নেই কোনো নিজস্ব স্টুডিও। গত দুই বছর ধরে বিভাগটি ক্যাম্পাস রেডিও চালু করার চেষ্টা করলেও এখনও সফল হতে পারেনি। যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ চালু আছে সেগুলোতে অবশ্যই সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পাস নিউজপেপার চালু করা অত্যাবশ্যকীয়। আশার কথা হলো, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা বিভাগগুলোতে প্রযুক্তিগত সুবিধা বাড়ছে। কিন্তু অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা ছাড়াই শিক্ষার্থী ভর্তি করছে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে স্বাবলম্বী হতে না পারার দায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজের তা কিন্তু নয়, এ দায় সরকারের এবং এ দেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোরও। উন্নত এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা বিভাগগুলোর সম্প্রসারণে এগিয়ে আসে। আমাদের দেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝতে হবে এটা তাদের জন্য বিনিয়োগ; এ বিনিয়োগ আখেরে তাদেরই কাজে লাগবে। দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নিয়ে যারা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাদের যদি আগেই পরখ ও ঝালাই করে নেয়া যায় তাহলে কর্মীবাহিনী নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর অসন্তুষ্টি অনেকাংশে কমে আসবে। এ ছাড়া এদেশে নতুন নতুন টিভি চ্যানেল হচ্ছে, এসব টিভি চ্যানেলের কর্ণধাররা চ্যানেল প্রতিষ্ঠার সময় ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা ভারত থেকে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ভাড়া করে আনেন। তারা দু'এক মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে উড়াল দেন, এদেশের সাংবাদিকতার সংস্কৃতি সম্মন্ধে না জেনে বুঝে যা দেন তাতে নতুন ও শিক্ষানবিশ সাংবাদিকদের বদহজম ছাড়া কিছুই হয় না। তাছাড়া এসব বিদেশি প্রশিক্ষকরা শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকদের সম্প্রচার বা টিভি সাংবাদিকতার কিছু মৌলিক বিষয়ে ধারণা দেন; কিন্তু সাংবাদিকতার কোনো কিছু না জেনে টিভি সাংবাদিকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়াটা বুমেরাং হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশি। উদাহরণ হিসেবে চ্যানেল ওয়ান চালুর সময় চলি শজন শিক্ষানবিশ সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলতে পারি। যাদের জন্য মালিকপক্ষ চলি শ লাখ টাকা প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ করেছিল; কিন্তু চ্যানেল চালুর পর ৩৫ জনই বুঝে গিয়েছিল সাংবাদিকতা সাংঘাতিক কিছু না হলেও, এর চেয়ে কম কিছু নয়। এই ৩৫ জনের মধ্যে পরবর্তীতে মাত্র ৬ জনকে সাংবাদিকতায় ধরে রাখা গেছে।

সাংবাদিকতায় পেশায় শিক্ষার অভাব কিংবা কার্যকরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংকট বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্বের সংকট বাড়িয়ে দিচ্ছে। এজন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আর পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগগুলোর মধ্যে

সুসম্পর্ক এবং যৌথ উদ্যোগ খুব দরকার। এ উদ্যোগ দেশের সাংবাদিকতা চর্চায় পেশাদারিত্বের সংকট অনেকখানি ঘুচিয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। এ সম্পর্ক বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের আরো শাণিত করবে। পাশাপাশি যারা সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে নিচ্ছে বা নিবে তাদের মধ্যে পেশা ছেড়ে দেয়ার আশংকা হ্রাস করবে। কারণ আমাদের দেশের সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের সংকটের বড় একটি সমস্যা হলো এ পেশায় স্থায়িত্বের অভাব। অনেকে এক ধরনের 'ক্রেজ' বা ক্ষণিকের মোহ হিসেবে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন; কিন্তু নানা কারণে তাদের মধ্যে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দেয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ অনেকের মধ্যে সাংবাদিকতা এখন 'অন্তর্বর্তীকালীন' পেশা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পেশার প্রতি দরদ বা ভালবাসার অভাব পেশা হিসেবে এদেশের সাংবাদিকতার অগ্রগতির লাগাম টেনে ধরছে। যত বেশি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা যাবে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা তত বেশি সুগঠিত হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে আমাদের সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্বের সংকটের আরেকটি দিক হলো মফস্বল বা গ্রামীণ সাংবাদিকতা। বেশিরভাগ মফস্বল বা গ্রামীণ সাংবাদিক কিন্তু খন্ডকালীন ভিত্তিতে অর্থাৎ অন্য পেশার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করছেন। এদের বেশিরভাগই সঠিক ও কার্যকরী কোনো প্রশিক্ষণ পাননা। অথচ প্রায় সব সংবাদ মাধ্যমের অর্ধেকরই বেশি সংবাদের উৎস এসব মফস্বল বা গ্রামীণ সাংবাদিক বা প্রতিনিধি। এদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংবাদিকতা বিভাগগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। এটি দুপক্ষের জন্যই সুফল বয়ে আনবে। কারণ এদেশের সাংবাদিকতার মান যত উন্নত হবে সাংবাদিকতার শিক্ষা ব্যবস্থাও তত উন্নত হবে। সাংবাদিকতা শাস্ত্র শুধু ভাল সাংবাদিক তৈরির শিক্ষা দেয় না, পাশাপাশি দক্ষ গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক তৈরির পথও সুগম করে। সাংবাদিকতার অংশ হিসেবে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শাস্ত্র। এর জন্য দরকার বিষয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও চর্চা। কিন্তু আমাদের গণমাধ্যম সম্পাদক ও ব্যবস্থাপকদের বেশিরভাগই বাইচান্স সম্পাদক। তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যেমন অভাব আছে তেমনি উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা রয়েছে। এমন সম্পাদকদের মানোন্নয়নে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় দরকার।

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্ব বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত কোনো বিষয় নয়। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের চরিত্র, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার চরিত্র এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পাশাপাশি বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামো ও গণমাধ্যম কিংবা স্বাধীনতা এবং জবাবদিহিতা শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতার যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ ব্যবহার ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ নিদর্শন তখনই সম্ভব যখন সাংবাদিকতা

পেশায় পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যেখানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ১০টি, সেখানে এখন দেশে এ সংখ্যা ২৫৪। ১৯৬৪ সালে চালু হওয়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি এখন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আরও দুটি চ্যানেলসহ আছে ২৪টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল; আছে বেশ কিছু এফএম ও কমিউনিটি রেডিও। এ বিস্ফোরণ যথার্থ তখনই হবে যখন গণমাধ্যম সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পেশাদারিত্বের প্রতিফলন ঘটবে। এ পূর্ণাঙ্গতা লাভের জন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক উদ্যোগ দরকার। কারণ গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবাদিকতার পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। এ উদ্যোগের অভাবে এখনও এদেশের গণমাধ্যম ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য কোনো সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়নি। ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। এদেশের গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আশির দশক থেকে অনেকবার সমন্বিত একটি গণমাধ্যম নীতিমালার প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যেটি হয়েছে সেটি হলো – বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে খন্ড খন্ড অনেক নীতিমালা করেছেন এবং করছেন। এসব খন্ডিত নীতিমালার বেশিরভাগই তাদের অসারতা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে। কারণ দেখা গেছে, এসব খন্ডিত নীতিমালা গাড়ির আগে ঘোড়া জুড়ে দেয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও এ সংক্রান্ত শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে এ সমন্বিত নীতিমালা তৈরির কোনো কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া যেসব দেশ সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তারা এ নীতিমালার অংশ হিসেবে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকতার শিক্ষাব্যবস্থাকেও এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সবশেষ উদাহরণ হিসেবে ঘানার কথা তুলে ধরা যায়। সাংবাদিকতা শিক্ষাকে কার্যকর ও কর্মমুখী করতেই সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়নকারী দেশগুলো নীতিমালায় এ সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিশ্বে এমন কোনো পেশা পাওয়া যাবে না যেটিতে সংকট নেই। সাংবাদিকতা পেশায়ও সংকট আছে। কিন্তু আশার কথা হলো অতীতে সংকট আরো বেশি ছিল। আবার দিন যত যাচ্ছে নতুন সংকট যেমন যুক্ত হচ্ছে তেমনি পুরাতন সংকটের সমাধানও হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বড় ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে এ যুগে বিতর্ক করার অর্থ বোকামি করা। সে শিক্ষাব্যবস্থাকে এ দেশের সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও পুরো শিল্পের স্বার্থে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় এবং এক্ষেত্রে দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম সম্পর্কিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের

সম্পর্ককে কিভাবে আরো সুদৃঢ় করা যায় তা নিয়ে ভাববার সময় অনেকখানি পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এখন দরকার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ ও কাজ শুরু করা।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরীঃ সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Expansion and Modernization of Journalism Education in Bangladesh

Professor Dr. Sakhawat Ali Khan
and
Dr. Abul Mansur Ahmed

The journalism education started in Bangladesh in 1962 with the establishment of the Department of Journalism at the University of Dhaka with a one-year Post-Graduate Diploma Programme. In 1968, a Masters course was added in the department. So, it can be said that the history of journalism education is not that much old in Bangladesh. But the growing importance of journalism in the modern world led the journalism educators to introduce a three-year B.A. Honours programme in 1977 and the department was renamed as the Department of Mass Communication and Journalism.

With the introduction of Honours course, the diploma course was discontinued. Few years back the Press Institute of Bangladesh (PIB) with the approval of National University has introduced a post-graduate diploma course in Journalism. The curriculum of the course is almost the same as that of previous Dhaka University course. PIB is also at the last stage of their preparation for introducing a Masters course in Journalism under National University. It may be mentioned here that in journalism education, Dhaka University is still playing a vital role in producing more market oriented graduates as well as conducting media related research programmes. The strength of this department is that many faculty members of the department are enlightened with western and regional curriculum through their higher studies and academic experiences abroad. Some of them have practical experience in journalism as well. The department offered a

regional Masters programme on Media, Communication and Journalism which ended in 2012. The programme was funded by the Norwegian government. Students from Bangladesh and Nepal participated in this programme. This programme has shown the strong leadership and scholarly approach of the department in enhancing journalism education at regional level.

This paper traces out the paradigm shifts in journalism education in this changing world. Technological advancement has made the world closer than ever before. It has become a dire need to cope with the emerging global development in the areas of journalism and media and communication education and practices. The changing scenario in the landscape of journalism education all over the world has created a new paradigm shift in journalism education in Bangladesh. Since 1990s, the expansion of journalism education spread to other public universities. The Department of Mass Communication at the University of Rajshahi was opened in 1992 and renamed as the Department of Mass Communication and Journalism in 2007. Chittagong University opened a journalism department in 1995 and later renamed it as the Department of Communication and Journalism. The Jagannath University started the Department of Mass Communication and Journalism in 2009 while Jahangirnagar University and Begum Rokeya University opened the same department in 2011 respectively. These trends indicate the popularity of journalism education in other public universities. All the same time efforts are going on to modernize course curriculum and pedagogic in public universities. In this regard, Dhaka University can claim itself as the pioneer in fostering journalism education in Bangladesh. The Department of Mass Communication and Journalism at Dhaka University is continuing technology-driven desk top publishing, video communication, photojournalism and cyber journalism to cope with the fast emerging new journalism and media. In this regard, Asia Foundation and DANIDA provided significant financial support. The journalism department at Rajshahi University offered a Post-Graduate Diploma Programme on Civic Journalism in 1995 and received technological facilities also with the financial assistance of DANIDA.

Unfortunately some management problems led the programme stop without getting further extension from the donors.

The private universities in Bangladesh started offering programmes on mass communication and journalism since late 1990s. There are at least eight private universities who have started such programmes. They are, Independent University of Bangladesh (IUB), University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), University of Development Alternatives (UODA), Stamford University Bangladesh, Daffodil International University (DIU), American International University Bangladesh (AIUB), Manarat International University (MIU) and Green University of Bangladesh (GUB). Both State University of Bangladesh and ASA University are planning to open the department. Quite a good number of other private universities are also contemplating to open such departments in different names. These programmes have created the scope for getting journalism education although some programmes may not have enough permanent faculty members and resources to ensure quality education. Due to high tuition fees in the private universities, most of the students are from affluent families capable of bearing expenses throughout the programme. In spite of many shortcomings it is evident that the journalism education has expanded in public and private universities over the years in Bangladesh.

We can see paradigm shifts from monodisciplinary to interdisciplinary and humanities to social sciences in the areas of journalism education. For example, the Mass Communication and Journalism department of Dhaka University shifted from Arts Faculty to Social Sciences. Even in public and private universities, technology-friendly approaches are gradually getting upper hand.

Both the media, print and electronic, have been undergoing moderate modernization with the support of computers and advanced technology. With more emphasis on market economy, private enterprises are venturing into new products and services, resulting into more advertisements from them to the media. The print and electronic media-especially television-have actually been enjoying very rapid growth over the last eight years. Most of the private television channels are trying to use advanced technology to

provide the audience a better service. Some channels have sophisticated technological support to bring live coverage to the audience. Due to technological advancement, the Bangladeshi diasporas around the world are getting access to the programmes of a good number of Bangladeshi private television channels. Moreover, the government-owned Bangladesh Television has also introduced a satellite channel known as BTV World.

Media industries are growing but some sort of oligopoly is evident in media ownership pattern. Quite a good number of them are owned by rich political personalities. Big business houses are also getting interested in the sector. Following the expansion of the media market, the job opportunities in the media industries particularly in electronic ones are increasing significantly. The number of journalism graduates is higher in many media houses ever than before. The leading dailies and private television channels are appointing increasing number of journalism graduates and quite a good number of them are now placed in the policy making positions. These young graduates, in most cases, are taking their jobs seriously with a sense of professionalism. The problem is that the professionalism cannot thrive much due to political parallelism or partisan media. The journalists' bodies are so much divided politically that they hardly could come to one platform to demonstrate their professional strength, unity and integrity. Another unfortunate problem is that, often an uneasy relationship exists between the journalists with formal institutional degrees and those who do not have it. It is important to bring the change in the mind-set of some of the most efficient and senior journalists having degrees in other disciplines other than journalism and working at policy making level with regard to entry of journalism graduates in the profession. The media houses failed to introduce proper search committee over the decades in the process of hiring journalists at entry level. This situation has sometime resulted in making the profession a dumping ground for rather unfit persons.

The ultimate journalism requires providing students with real-world experience, concentrating on developing their critical, analytical and linguistic skills, fostering their sense of journalism

ethics and social responsibility and teaching them how to transform information into knowledge. The journalism departments particularly that of Dhaka University, are moderately successful in producing graduates with quality journalism education despite some limitations of resources.

We must mention here the role of institutions who are relentlessly arranging training for the in-service journalists and persons interested to join media. Training courses are of different durations and the sponsoring agencies generally give certificates to the participants.

Press Institute of Bangladesh (PIB) which is a government organization is perhaps the oldest and most active amongst such agencies. Few private training institutions are also regularly arranging such courses. Some of the NGOs occasionally conduct training courses mainly with the help of guest resource persons.

Last but not the least, ever increasing interest among the students of new generation about the discipline is one of the main factors behind the expansion of journalism education in Bangladesh. But so far as the modernization is concerned, we must admit the lack of adequate facilities. For example, the pioneer institution in the field, i.e., the Mass Communication and Journalism Department of Dhaka University do not even have facilities to bring out a practice journal, which is essential for the practical orientation of the students of print media. Campus radio and Campus TV are used in advanced countries of the world to train up students of electronic media. Establishment of such facilities has remained a dream of the faculty members of our universities. With the establishment of a new popular democratic government in the country, it is expected that a new era of journalism education will usher in at the public universities. And who knows, even the affluent private universities taking into cognizance the ever-growing popularity of the subject, may bring in most modern equipments to attract more students to their journalism departments.

Lastly, we hope that with a proper mix of theoretical and practical training, journalism education in Bangladesh will produce required number of skilled newsmen and researchers in the field.

Sources Consulted

Ahmed, Mansur A. (1995). Media and Journalism education in Bnagladesh: Seminar Paper, Presented at the seminar in Bogra.

Journalism Education in International Perspective. International Communication Bulletin (Fall 2007).AEJMC Publications, Vol. 42, No.3-4.

Rahman, G. (2007) 'The Role and Impact of Alternative Media in Bangladesh' in Media Pluralism in Asia: the Role and Impact of Alternative Media, edited by Seneviratne, K. AMIC, Singapore.

Rhaman, M. (2008). 'Paradigm Shift in Journalism Education in Bangladesh'. Seminar Paper presented at the seminar in Stockholm.

Sultana, A. (1997) 'Journalism Educators and Media Professionals in Bangladesh: Academy-Industry Relations', The Dhaka University Studies, Faculty of Arts, 54(2): 159-69

Ullah, M. S (2007) 'Scholarly Turn of Journalism Education: Redesigning Curricula at University Level in Bangladesh', paper presented at the 16th AMIC Annual Conference titled Media, Education and Development: The quest for new Paradigms held on 25-28 June 2007 in Singapore.

Press Ethics in Bangladesh: Concepts and Practices

Dr. Sudhangshu Sekhar Roy

Prelude

The ethical philosophy of Bangladeshi media is seemingly not so strong through which all the journalists would be able to work under it with a very homogenous approach. The age of media industry in Bangladesh, especially the print media is not little as the first newspaper of this land (sovereign Bangladesh) was appeared in 1847 from Rangpur. However, the television medium is crossing through a crucial period as its functional age is more or less fifteen years in terms of open competition era; even then a uniformed and concrete philosophy of the media is not yet conceived and developed. Although there was a slim chance for media in seventies and eighties of last century to develop a concrete and uniformed policy but that hope was simply dashed as most of the houses and their journalists had been opted to go for individually. They generally feel the ethical philosophy of any media house is solely of their own. Most of the journalists do not have their professional mentality to follow the available guidelines or ethics either written or hidden. However, the available written codes in Bangladesh is not significant and effective in print media, and in the electronic media, this is flatly missing. Despite that, they generally do not in favor of government-endorsed policies for being feared of governmental intervention of freedom of press. But, irony, most of the media houses do not have their own formal ethical policies except a very few, rather they dependent on certain 'situation' to handle any emerging crises or issues like BDR mutiny in 2009. This is virtually a dilemma of ethics. As a whole, the

ethical scenario of Bangladeshi media environment is not quite transparent. But, it is generally perceived, journalists have to follow and maintain universally and widely accepted ethical philosophy that would led them to formulate their own appropriate policies. Due to the dearth of good ethical philosophy as well as the practices, the journalists are always seen arrogant and maintaining an ignoring tendency.

What We Mean Ethics

Ethics is a set of moral principles or rules of behavior that govern or influence a person's behavior. Ethics in other way is the characteristic spirit, moral values, ideas or beliefs or guidelines of a group, a community or a culture. The term *ethics* comes of a term *ethos* – meaning for character of what a good person is or does to have a good character. The other version says: the word ethics derives from the Greek word *ethos*, meaning the traditions or guiding spirit that governs a culture.

Ethics deals with philosophical foundations of decision-making, of choosing among the good and bad options that one faces, and *morality* on the other hand, comes from the Latin *mores* – way of life or customs. It refers to the way or manner in which people behave. So ethics – philosophical foundations while morality – way or manner or the process in which people to act or behave. So morality has come to mean – socially approved customs or the practice or application of ethics

Ethics and Responsibility

Social responsibility and ethics are almost interchangeable, because we believe that members of institutions have societal obligation to function responsibly, and ethics are the manifestations of that societal consciousness. More you are ethically strong more you are responsible. *Fields* related to ethical issues are Advertising, Public relations, and all typical mass media like newspaper, radio, television, film etc. Besides, the social media is hugely the centre of interest now to have the inherent tendency of committing the ethical

lapses. And in every field, there is huge obligation to maintain responsibility.But reckless pursuit of presenting ethically deviated news/ information has been destroying the spirit of responsibility and creating an ill- psyche of the readers and viewers

Some Issues for Debate

TV programs, both bulletins and entertainments, have too much violent and are socially destructive!

Rap music is obscene and misogynistic!

News reporting is biased by commercial or cultural influences and impositions!

Ever rising public relations or advertising campaign unfairly manipulates public opinion!

Film is too obscene, projecting mainly the fantasy and exporting alien theme and culture unsuitable for one country's ethical standard and stimulating the violence.

Action and Limitations of Ethics/ Laws

In maintaining ethics, nobody imposes any restrictions. It is spontaneous. You need to learn the lesson of maintaining it. You need to learn it from family first, then the academic institutions, and for those professionals who are working in their respective media houses.

They should learn and learn the habit of respect from the set of ethics. Ethics is the set of principles to abide by. Customs or values are to be adopted by a delegated committee of a culture or community for regulating the behavior of members of a community or a country. You have to respect it. It not, then you are to be scolded and to be motivated to respect it but there is no gross provision of punishment.

And *Laws* are bottom line, if you violate then you are to be punished. All the rules and regulation formulated, established and introduced by an appropriate authority. Laws should usually be formulated and ratified by legislature of any form in any civilized and democratic society. Any traditional (sometimes primitive)

society's elderly people can create a set of regulations which have to be respected; otherwise, an appropriate punishment can be awarded to anyone who breaks those rules and regulations.

Law is simply the imposition. You must to respect, if not, then you would be forced to respect. If it is not forced, then formulation of laws is useless and becoming funny.

It is good for a community to maintain the values, norms, which once created spontaneously, or at least said in any document; in that case we do not need any law.

Laws to be forced or imposed. Ethics are to be followed. When we do not follow the ethics then the law should be imposed.

But problem is, some journalists are *insensitive* to ethics, some others are very *hypersensitive*. So we have to strike a balance between the two. We should not remain blind to ethics, or we should not be over reactive.

Constitutional Guideline

Journalists are very sensitive for not to be restricted by any laws. This is the spirit of freedom, but freedom does not have any unlimited boundary. Newsmakers obviously enjoy the freedom but they would be held responsible for any kind of misdeeds. For that they need to respect the ethics. Constitution is said to be the mother laws of other laws, but it mainly provides guiding principles. The article 39 of Bangladesh Constitution ensures freedom of press while suggesting maintaining respects to morality and decency. It says,

39 (1). Freedom of thought and conscience is guaranteed.

39 (2). Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relations to contempt of court, defamation or incitement to an offence-

(a) the right of every citizen to freedom of speech and expression; and

(b) freedom of the press are guaranteed.

The spirit of article 39 is similar to the Aristotelian view of *moderation* and *compromises*. It reflects the check and balance between the freedom and violation. The philosophy of article 39 of

the Constitution is to restrain the newsmakers from committing ethical lapses imposing some lawful conditions even after giving lavish freedom. But, constitution is virtually a guideline, not a law. Thus it cannot penalize the journalists who are to commit the wrongdoings. However, the laws relating to press available in Bangladesh is almost adequate and those laws act as deterrent bringing the press people under the court of justice whenever they commit any kind of slips. But, the practice of enforcing deterrent legal actions is not evident enough as the people, who fall prey to the wrongdoings of the press, usually do not go to the door of justice seeking redresses of any kind of their grievances. People of Bangladesh are generally very generous and liberal who do not take ethical issues seriously, and the process and procedure of legal system is so lengthy and complicated that people always feel de-motivated to go to the court for any kind of action. This state of inertia actually has given the press a kind of upper hand, and for that, sometimes they advance further of committing more lapses as there is no virtual application of defense against the ethical degradation.

Besides, constitutional restrictions, we have a few typical written guidelines for the journalists of print media. Journalists' community has a watchdog to watch their activities i.e., the Bangladesh Press Council. However, this watchdog is so weak in terms of its area of acts and strength that it always needs government-pumped oxygen to live. It has a very limited magistracy power and institutionally not so strong enough to go for any action against any newspaper that is to commit any kind of violation of ethics. It is just like big brother, who scolds newspapers time to time whenever necessary, but the newspapers mostly overpower the Press Council as their corporate strength is much more powerful than the power vested on Press Council.

As per The Press council Act 1974, the council has introduced 25 codes of conduct to be followed by the journalists of print medium mainly as TV medium did not flourish then. Out of 25 codes, not less than 15 are at all effective to properly guide the journalists of the newspapers. Huge overlapping is there and the inner meaning of the codes is so weak that it does not work effectively. Most of the codes

are not useful, rather a hollow emotional rhetoric. Some of them are so emotional, ambiguous and vague that some people would raise serious objections about their merits as codes. Very few of them are really applicable for the journalists whenever they are at work. Without very slim exceptions, the most of the newspapers and journalists, however, do not bother the codes of conduct and some other do not have even any idea at all. This is the result of no major punitive actions being taken from the watchdog of the watchdogs in one end and the journalists are not being well familiar with the codes on the other. Nevertheless, it is a satisfactory note that Bangladesh has at least a set of written codes for the journalists of print media, but this one is flatly missing for the broadcasting media. Despite efforts for last fifteen years we are yet to formulate and incorporate a broadcasting policy.

State of Ethical Practices

The ethical standard of journalism in Bangladesh, television media in particular, has been remarkably degraded. The trailers of this field are very much aware in this issue, but not at all careful regarding appropriate content and tasteful presentation. And all these things are being happened as the policy makers of this media are not yet professionally or ethically matured or respectful. So, we need a broad-based media policy applicable for all kinds of media involving the media associates, the government, the civil society, the media academics and the judiciary. The policy should not be only for protecting the media from the onslaught of the government for political reasons; it would work just like an umbrella of the watchdogs (media). Media should not talk about others accountability they should take the burden of being monitored. A full-fledged representative body would get a monitoring power as per this policy which would look after all the goods and bads of the media; by the side they can have their own alternative training house to provide a unified, not necessarily universal, training for the

journalists especially ethical issues. In spite of huge criticism during BDR mutiny issue earned by the television media, it still has been suffering from an unhealthy and distasteful showmanship. They are genuinely prejudiced to show sensational objects.

Showing dead bodies of army people wrapped in gunny bags during BDR carnage in February, 2009 was simply the manifestation of poor taste by the electronic media. The process of recovering the dead body of a student of Rajshahi University, who was killed by the opponent students' wing of his organization he belonged and dumped into a manhole couple of years back, was shown in TV screen spending more than couple of minutes in almost all the television channels. Very recently we have seen in all television screens how one Biswajeet was being murdered. Is it simply for objectivity?

Instead of being active in bringing the dead man's burning body on our television screen, the television crew should have rather initiated the humane effort to put off the blaze from the body and that would have been more civilized.

In the UK, the television newscasters caution the viewers of even flash photography on any news coverage of superstars and we still often falter to care for basic human norms in Bangladeshi news channels.

I do not wish to shudder while watching Bangladeshi channels any more and would hope that the respected news moderators of these television channels would abide by basic international standards of news coverage.

The sudden influx of cable television channels have recruited many enthusiastic and sometimes challenging and brave news reporters but we should also be attentive to training the crew with code of conduct relating to news coverage (The Daily Star, 2009: 13)

On the other day on June 7, 2010 a TV channel of Bangladesh at least showed a severed head of an unfortunate guy, which one holding in his lap a hoodlum just went to a hotel demanding huge lump sum otherwise his fate would be like that individual. Not only

the severed head but the dead man's headless body was also shown. Are these for objectivity or simply showmanship or unethical competition? This is the result of the 'lust for the first'. You cannot rush only for juicy news and sensational presentation. But, who cares? Journalist himself or gatekeepers like news editors, chief reporters or policy makers themselves? Nobody knows.

Wrong Nourishment

Journalism in Bangladesh right now especially in TV media is simply a glamorous and lucrative job for the to-be-journalists. They want to create a glamorous image in the market, and by the side they want to become financially solvent within very few years after their entrance in the profession. Very interestingly, the present trend prevailing among the young people is - the boys want to be reporters and the girls either want to be the newscasters or the anchor-person. The face value of a TV reporter or anchor-person pulls financial benefit from the other side besides journalism field. As soon as they were hired, they are being asked to jump to the fighting field of bringing more than one items everyday without providing appropriate enough ethical training and professional integrity Automatically the editing side has been facing a dearth of good quality people now, and it has been reflected in the wrongly selected content and treatment, bizarre translation and improper pronunciation, biased and ill-motivated opinion, and lastly always negative and sensational presentation.

I am completing my write up with a statement, 'There can be no freedom unless the Press has the right to be irresponsible'. Would we think it twice?

Reference

Biagi, Shirley (1992): *Media Impact (An Introduction to Mass Media)* 2nd edition; WadsWorth Publishing Co. California

Black, Jay, Bryant, Jennings and Thompson, Susan (1998): *Introduction to Media Communication,* 5th edition, McGraw Hill Companies Inc.

Ghosh, Subir (1996): *Mass communication Today* (In the Indian Context); Profile Publishers,
Calcutta.

Meyer, Philip (1987): *Ethical Journalism*; University Press of America

The Constitution of the people's Republic of Bangladesh (As modified up to 2003)

Islam, Mufassil (2009). News and ethics (Letter published in the Editorial page); *The Daily Star*.

Dr. Sudhangshu Sekhar Roy: Associate Professor, Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka

Experience as Press Ombudsperson

Media Ethics and Professionalism: Dynamics in a Developing Country

Md. Golam Rahman, PhD

Press in Bangladesh is pursuing its activities to uphold the democratic interest of people and is committed to social responsibility that springs from the spirit of liberation struggle in 1971. Amader Shomoy, a new trend in Bangladesh newspaper arena, introduced an Office of Press Ombudsperson for the first of its kind in Bangladesh on January 01, 2011. Amader Shomoy is a Bengali language daily newspaper published from Dhaka, Bangladesh since 2004 by Nayeemul Islam Khan as Editor. The daily hit the market as a small newspaper, comparatively fewer pages and low price. When usual daily newspaper used to cost around Tk 8 - 10 (10 cents) where as Amader Shomoy was priced at Tk 2. The daily became a popular paper, especially among the commuters, office-goers, shop-keepers and commoners. Initially the paper contained small advertisements and most of the news presented in a concise format in four pages. Gradually the paper increased its contents and pages and increased its price to Tk 3 and Tk 4 and added advertisements too.

Press Ombudsperson

The Press Council of Bangladesh, a quasi judicial body, was established in August 1979 under the Press Council Act 1974, with a view to preserve the freedom of the press and to maintain and improve the standard of newspapers and news agencies in Bangladesh. In its capacity, the Press Council as an adjudicating body, sitting as a court to inquire into the complaints by the

aggrieved. The Council has been handling of complaints against abuses of the press during its existence of more than three decades. The media scenario has expanded in Bangladesh as about 470 newspapers are being published of which about 294 are daily newspapers. Some 98 papers are published from Dhaka, the capital of Bangladesh and there are weekly and other periodicals. (ABC Report, 12 June 2011). More than one dozen of private television channels are in operation and another dozen of TV channels are waiting with formal licenses from the government for transmission. So there is still a lot to do in this line.

In general it has been seen that most aggrieved people do not like to file petition against a newspaper to the courts and often they are reluctant to go to the Press Council, because of lengthy procedures involved in getting remedies, although they feel, they are deprived of exercising their rights. At the same time the body of the Council get restructured by the government with a political twist. Often the post of Chairman of the Council became a political appointee. Prevailing the situation the newspapers and other media never thought of themselves to address and mediate the professional grievances, but the editor of Amader Shomoy stepped in to an environment to introduce the position of Press Ombudsman. After some consultative meeting with journalists and media professionals the name has been conceptualized avoiding gender sensitive word and it became Press Ombudsperson.

With an over-all objective the Office of Ombudsperson would look at to improve the quality of reporting and presentation of news of Amader Shomoy. With this motto, the Office of the Press Ombudsperson has been established and the functions of the office would be drafted to discharge accordingly. It has been apparent that this office might play pivotal role in providing adjudication to the aggrieved maintaining the freedom of the press.

The Office of Ombudsperson at Amader Shomoy may be considered as a buffer between the press and people. The establishment of the Office of Press Ombudsperson followed the realization of the requirement for an independent authority for

safeguarding the freedom of the press and protecting individuals and institutions from excess by the journalists.

In general, an ombudsperson would handle complaints and attempts to find mutually satisfactory solutions. A press ombudsperson receives and investigates complaints from readers of the newspaper Amader Shomoy of accuracy, fairness, balance and good taste in news coverage. S/he would recommend appropriate remedies or responses to correct or clarify news reports. Press Ombudsperson of Amader Shomoy will also keep an eye to take suo mottu decision to ask for explanation to a reporter/journalist/writer of any news that seems objectionable to good journalistic practice or public taste.

Functions of Ombudsperson

The Office of Ombudsperson will perform the following functions for Amader Shomoy:

1.To facilitate the newspaper to maintain freedom of expression guaranteed in the Constitution.

2.To provide the public with fair, free and quick method of resolving any complaints they may have pertaining to the newspaper.

3.To develop a professional code of ethics for the journalists.

4.To activate the Office of Press Ombudsperson to provide remedies to the aggrieved.

Goal to Achieve Good Journalistic Practice

By doing so the Office of Press Ombudsperson (OPO) will achieve the following:

a) Facilitate the profession of journalism by achieving high ethical standards in reporting and presentation of news, views, pictures, advertisements and other contents.

b) Create a credible news environment and make the press accountable to the society.

c) Make a forum for exchanging experiences, opinions, information among the internal public as well as external public of the newspaper.

d) Develop the perception of ventilating public participation on media contents.

e) Keep contacts with editors, professional organizations, Press Councils and other media houses to enhance the standard of journalism.

Modalities

The Office of Press Ombudsperson (OPO) at Amader Shomoy will operate by the spirit of Code of ethics [appendix-A] that has been adopted for Amader Shomoy or any addition and/or alteration thereof time to time with the following outlines:

When a person feels that s/he is affected by a report/ reports published in the newspaper because of breaching the code of ethicsthen s/he can lodge a complaint against the paper to the editor mentioning her/his grievances. If s/he does not get any remedy from the editor then s/he can complain to the Office of Press Ombudsperson.

Complaint must be filed within one month of the publication of original item.

The plaintiff/applicant should explain why and how s/he is being affected by the printed report/picture/write-up.

The plaintiff/applicant should state if a report/picture/write-up published is not true or not based on facts that affect her/him or damages her/his reputation or defamatory in nature.

To file a complaint to OPO is free of charge.

Any interested members of the public can lodge a complaint with the OPO against newspaper items they regard as a violation of good journalistic practice. But the person to whom the article relates must provide written consent if the complaint is to result in formal criticism of the newspaper.

The newspaper that has been found to violate good journalistic practice is expected to publish the written decision of the Press Ombudsperson. Press Ombudsperson (PO) will scrutiny the application filed and will judge the allegation against the paper.

The PO has reason to believe that the newspaper has offended against code of ethics, the PO, after giving the reporter, chief

reporter, sub-editor, news editor, or a journalist, or editorial staff, or editor concerned with the publication of the report an opportunity of being heard, hold an inquiry. Thereafter, if the PO is satisfied s/he can in writing warn, admonish or censure the reporter or/and the journalist involved, as the case may be. S/he may also instruct the newspaper to publish the decision or the notice of reprimand to reporter/journalist concerned on the case when deemed necessary.

If the PO is of opinion that it is necessary in the public interest, so to do, it may require any staff of the newspaper to be summoned or asked to explain on the publication of an item or on an issue or treatment of any news or item.

Experiences as Press Ombudsperson

Journalists at Amader Shomoy at its house meeting informed their limitation of professional knowledge. The Ombudsperson reviewed the prevailing practices at the house and felt to prepare a set of journalistic code. Newspapers in Bangladesh inherited traditional laws, rules, and some norms to run their profession and business and with few exceptions no newspaper has a written code of ethics. Many of them follow the traditions and precedents as well as seniors' experiences. On the appointment of Press Ombudsperson, the editor of the paper invited some editors and senior journalists to exchange views and opinions on the activities and terms of reference of newly appointed Ombudsperson and its office since it was for the first time in this country.

On understanding and reviewing the press codes and activities of Press Ombudsman in several countries and also activities of Press Councils in different parts of the world this Press Ombudsperson compiled and drafted a set of code of ethics to be followed by the journalists of Amader Shomoy. The draft code was discussed with the journalists of the paper in several sessions and latter the draft-code was circulated and discussed with journalism teachers of the university and foreign experts. Opinion provided by them were incorporated in the code and a spirit of fair journalism infused in the document. On the basis of the draft-code of ethics the reports of

journalists were reviewed and directions given to them. The ombudsperson usually marks published items which does not maintain the code of ethics and the person(s) involved in writing or editing had been served a notice from the Office of Ombudsperson to appear before the office and defense themselves. After the hearing or written statement by a journalist the ombudsperson issue a judgment. Often the incumbent journalist gets warning or censured on the act and sometimes instructions were given to print corrections. Many of those cases were undertaken as suo motto by the Ombudsperson. It started with an announcement made in the paper on 9th July 2011 (appendix-B). Later, an analytical article from the Office of Press Ombudsperson mentioning several cases was also published (appendix - C).

In some cases it has been observed that the lapses were committed by journalists by ignorance of ethics and some time policy of the paper was responsible where editorial decision played important role. Some news items had been adjudged as product of shabby and slap-dash writing, which suffered from journalistic standard. Some items got published without verification of facts and happenings by reporters, although they were not challenged by any party, but the Office of Ombudsperson scrutinized them and the concerned reporters were admonished and warned in future this sort of report should not appear any more. On publication of indecent advertisement, the Office of Ombudsperson issued direction in future to look at advertisements contain illicit texts and illustrations before publication and take steps not publish them.

When there was a written complaint by an aggrieved person against any published news the Office of Ombudsperson issued a formal notice to the concerned reporter to appear at the Office. On hearing of the reporter and after a conversation with him about the factual integrity, the Office come to a decision whether s/he should be served with notice of a caution in future/ a warning, or s/he should be admonished/ censured, or any other punishment. The word punishment has been used as action of professional discipline.

It has been observed that some news item published in one edition of the day became shortened in another edition, but lost its originality and suffered from factual integrity. Sometimes news was written very loosely without following basic structure of news by the news practitioners, resulting denial of readers' rights as consumers of information. It has also been observed that there was news item published with pseudo name and the newspaper hold the responsibility of the published item, although the person could not be held responsible and accountable when the factual integrity was in question (News published on 26 April 2011, page 8). For one such published item the editor apologized unconditionally.

Conclusion

In this brief period of the Office of Ombudsperson in Amader Shomoy in a country like Bangladesh, I understand a job that had been created which showed spectrum of expectations and enormous responsibilities, at the same time it would require big deal of new culture to be nurtured. The journalists in the newspaper initially felt tensed and fear on the emergence of the Office of Ombudsperson and many felt hidden pressure on their less-cared activities. On the other hand the over-all standard of the newspaper is in question, especially the publication of unethical advertisements in some editions. The activities of the Office of Ombudsperson alone may not bring a qualitative change in the profession unless economic emancipation of the journalists and employees take place. It seems, the journalists and staff in general are low paid resulting their motivation in the profession is partially hampered. There is a problem with the ownership of the paper which recently put it to the court. At the same time the Office of Ombudsperson faces a reality of uneasy working situation, hopefully, for the time being.

The Office of the Press Ombudsperson will prevail above a person's activity rather than it should grow as an institution of media professionalism. Ombudsperson has written several columns in the paper mentioning the contribution of Press Ombudsman in different countries journalism and desired a historic role of Amader Shomoy

in the healthy journalism of the nation. Many newspapers in the country will initiate the process of establishing Office of Ombudsman, a few have already looking for appropriate persons for the job. But future is not that bright, a lot of hurdles to be crossed successfully by the press authorities - the editors, the managers, the owners, and above all, the press people.

The paper was presented by Professor M. Golam Rahman, Press Ombudsperson of Daily Amader Shomoy (January - August, 2011) at the Annual Conference of Organization of News Ombudsmen (ONO) held in Copenhagen, May 22, 2012.

Appendix

Office of the Press Ombudsperson (OPO)
Code of Ethics for Amader Shomoy

Ethics for journalists working in *Amader Shomoy*:

1. Journalist will expose the truth and present incident objectively.
2. Journalist will not publish anything which is indecent. Journalist will avoid indecent and crude words.
3. Journalist will bring to light truth with utmost honesty and impartiality.
4. It is responsibility of reporter to mention source of news. Reporter must mention source for the sake of credibility of the news. It is also ethical duty of the reporter to maintain confidentiality of the source if the source prefers not to be named for security. In such case reporter will not break promise given to source.
5. Any mistake be it unintentional or intentional goes against principles of journalism. Corrigendum must be published as soon as mistake is detected. Corrigendum must get same treatment in terms of importance and placement as the original news.
6. Reporter can seek information from any individual, authority or organization but can not force them to get it.
7. In case of any allegation against any person in a report, the person must get chance for self defence.
8. Journalist or newspaper can not interfere in personal life of a person. Personal life has a boundary. If activities of a person affect general people,

harms the country or hamper public interests, report can be published on the person's activities.
9. While filing a negative report about a person, personal life, religion, gender, cloths, physical or mental disabilities, sex habit etc. must be avoided.
10. Making defamatory and objectionable comments against an accused person before conviction go against principles of journalism. A person under trial can be termed accused, not criminal.
11. Newspaper must not make comment on a convicted person that may humiliate parents, relatives in the society.
12. Newspaper should not run negative report or make mockery of mentally and physically challenged persons. Journalist must keep it in mind that they are integral part of the society.
13. There should not be any negative reporting or effort belittling any religion, ethnic group, gender or life style, food habit, culture etc.
14. Journalist must maintain restraint and patience in dealing with sensitive or sensational issues. Journalist must not file a write-up which will worsen the situation.
15. Journalist must be respectful to different ethnic groups, religion, color and nation. It is moral obligation of reporters to show respect to their life style and characteristics.
16. Journalist will not write to serve special class. Reporter can not feel to belong to special class. Reporter will expose news to public with utmost neutrality. Nurturing own like, dislikes or aligning with a particular quarter is against norms of journalism.
17. Newspaper cannot reprint other's writeup or publication without permission. Source must be mentioned while quoting information from any book and newspaper.
18. Reporter will not file report in favor or against a person in exchange of money or benefits.
19. Reporter will not take money, gift or bribe from a source. Reporter will not give in to temptation which may influence professional duties. Reporter can though receive a courtesy gift presented to all reporters in a program. Reporter should not accept a travel offer proposed by an organization for own interest. In special circumstances reporter can accept travel offer but should not divert from his/her responsibilities.
20. Journalist must perform duty going beyond narrow political mindset. Newspaper can carry report on politics. But newspaper will not play such a

role that will give impression to readers that it is aligning with a particular political party.
21. While filing report on crime, journalist must keep in mind that reporting should not spread criminal incidents. Rather it should focus on bad things about crime and point to reason to criminal incidents.
22. Journalist must be watchful that any advertisement cannot be presented in disguise of news.
23. Journalist has to be careful in writing report on women so that a report may not dishonor women community.
24. Journalist must consider human right issue in reporting on women, children and human trafficking. If photograph needs to be published, face has to be covered or filter can be used so that they are not dishonored. Reporter must refrain from mentioning name of victim. Fictitious name can be used.
25. Indecent, vulgar or gruesome photograph should not be published. Journalist must refrains from publishing any photograph which may hurts social values.

Appendix - B

আমাদের সময়
সংবাদ ন্যায়পাল দপ্তর

কার্যকর পদক্ষেপের শুর"তে...

ড. গোলাম রহমান

আমাদের সময় বাংলাদেশে সংবাদ ন্যায়পাল প্রবর্তন করে আধুনিক সাংবাদিকতা পেশায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। বাংলাদেশে সাংবাদিকতায় সংবাদ ন্যায়পাল এর প্রবর্তন এই প্রথম, স্বাভাবিকভাবে সংবাদ ন্যায়পালের দপ্তরকে কার্যকর রূপ দেয়াও একটি নতুন উদ্যোগ ও নতুন চ্যালেঞ্জ।

সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রমকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে শুর"তেই বিবেচনা করতে হচ্ছে এর আওতা কিংবা পরিধি এবং রূপরেখা। রূপরেখা নির্ধারণের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্ন দেশের সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম গবেষণা করা হয়েছে। এতে মনে হয়েছে, প্রতিটি সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম ও দায়দায়িত্ব ভিন্ন এবং এক দেশের কিংবা একটি পত্রিকার সংবাদ ন্যায়পালের সঙ্গে অপর সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম ও দায়দায়িত্বের মিল নেই। তবে কার্যপরিধির ধরন এবং ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই ধারণা (perception) থেকে সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম ও কার্যপরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রের জন্য একটি নীতিমালা (code of ethics) প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

যদিও প্রতিটি সংবাদপত্র কতিপয় নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে কিন্তু

আমাদের দেশে বেশিরভাগ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সংবাদপত্রের নীতিমালা প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ইতোপূর্বে ২১ ধারা সম্বলিত একটি নীতিমালা নিয়ে সাংবাদিক মহল সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা বলেছিলেন নীতিমালা প্রণয়নে তাঁদের সম্পৃক্ত করা হয়নি। *ডেইলি স্টার*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এস. এম. আলী প্রসঙ্গত উলে খ করেছিলেন যে আমরা পরিষ্কার পটভূমি থেকে কোনো কাজ শুর" করতে পারিনা ("We are unable to start on a clean state." – Daily Star, July 20, 1993)।

এক্ষেত্রে *আমাদের সময়*-এর সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রমকে ফলপ্রসুভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি নীতিমালার খসড়া নিয়ে ইন-হাউস সাংবাদিকদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার দেশি-বিদেশি শিক্ষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে এবং এটি চূড়ান্ড় অনুমোদনের জন্য রয়েছে। সাংবাদিকতার এই নীতিমালা না মেনে কোনো সংবাদ পরিবেশিত হলে সেটির ব্যাপারে পেশাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পেশাগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ড় অনেকক্ষেত্রে যথার্থভাবে নেয়া হয়না; অনেকসময় এড়িয়ে যাওয়া হয়। নীতিমালা না মানার কারণে প্রকাশিত সংবাদের পরিণতিতে কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করতে পারেন; প্রতিকার চাইতে পারেন। প্রতিকার বিধানে সংবাদন্যায়পাল সচেষ্ট থাকবেন। সংবাদ ন্যায়পালের কার্যালয় এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সংবাদ ন্যায়পালের কাজের পরিধির অন্যতম একটি হচ্ছে স্বপ্রণোদিত হয়ে *আমাদের সময়ে* প্রকাশিত নীতিমালা লংঘিত হয়েছে এমন সংবাদ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে কতিপয় প্রকাশিত সংবাদ সংবাদ ন্যায়পালের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং সংশি ষ্ট সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা কিংবা কৈফিয়তের প্রেক্ষাপটে পেশাগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে ও জবাবদিহিতামূলক সাংবাদিকতার কথা বিবেচনা করেই সংবাদন্যায়পালের কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে প্রকাশিত সংবাদ এর বিষয়ে যদি কেউ কোনো প্রতিকার কিংবা প্রতিবিধান চান, তিনি সংবাদন্যায়পালের দপ্তরে জানাতে পারেন:

আমাদের সময় সংবাদ ন্যায়পাল দপ্তর
দৈনিক আমাদের সময়, ৬৫ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা -১০০০
ফোন: ৯৬৬৬৪০১
ইমেইল: pressombudsperson@amadershomoy.com

Appendix – C

আমাদের সময়
সংবাদন্যায়পাল দপ্তর

সাংবাদিককে জবাবদিহি হতে হবে

ড. গোলাম রহমান

বাংলাদেশে সংবাদ ন্যায়পাল বিষয়ক ধারণাটি একবারে নতুন, যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি চালু রয়েছে। জাপানে ১৯২২ সালে সংবাদপত্র পাঠকদের অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। টোকিওতে *আশাহি সিম্বুন* পত্রিকা এ উদ্যোগ নিয়েছিল তার প্রায় ২৬ বছর পরে *দি ইউমিউরি শিখুন* তাদের স্টাফদের নিয়ে সে কাগজের মান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৫১ সালে

এই কমিটি ওমবুডসম্যান কমিটি হিসেবে পরিগণিত হয় এবং যা নাকি বর্তমানে পাঠকদের অভিযোগ শোনে এবং পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম ইদানিং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় এবং এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশে এর কার্যক্রম ভিন্ন মাত্রায় পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকারের শাসন ব্যবস্থায় 'ন্যায়পাল' সাধারণত পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করে থাকেন। সুইডেনে ১৮০৯ সালে সর্বপ্রথম সেদেশের সরকারে বির"দ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ মেটানোর জন্য ন্যায়পাল নিযুক্ত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্পোরেশন, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সংস্থায় ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রয়েছে।

সংবাদ ন্যায়পাল সাধারণত কী ভুমিকা পালন করে থাকে? দেখা যায়, পাঠক/দর্শক শ্রোতার অভিযোগ নিষ্পত্তি করাই সংবাদ ন্যায়পালেন প্রধান কাজ। কোনো কোনো সংবাদপত্রে তিনি পাঠকের প্রতিনিধি; বা 'পাঠকের অ্যাডভোকেট' কখনো পাবলিক এডিটর। ভিন্ন দেশের ভিন্ন পরিস্থিতি। কোনো কোনো সংবাদপত্রে তিনি সংশোধন প্রস্তুতিতে সাহায্য করেন; কখনো কোনো সংবাদপত্রের নিউজলেটারের জন্য পাঠক অভিযোগের ভিত্তিতে কলাম লেখেন; কখনো জনগুর"ত্বপূর্ণ ইস্যুতে তিনি ব্যাখ্যা বিশে ষণ ও বিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করে থাকেন। তবে পাঠকের স্বার্থকে গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করা তার অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে দেখা যায়।

আয়ারল্যান্ডে সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম সকল সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও মুদ্রিত মাধ্যম যারা প্রেস কাউন্সিলের সদস্য তাদের নিয়ে পরিগণিত হয়ে থাকে। সুইডেনে সংবাদ ন্যায়পালের কার্যক্রম চালু হয় ১৯৬৯ সালে। যেকোনো ব্যক্তির সাংবাদিকতায় সুষ্ঠ পেশার ব্যত্যয় দেখলে অভিযোগ আনতে পারেন সংবাদন্যায়পালের কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জনগণ ও সংবাদপত্রের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রেস কাউন্সিল, প্রেস ওমবুডসম্যান, প্রেস অ্যাপিল প্যানেলস বিদ্যমান। ভারতের 'দি হিন্দু' সংবাদপত্রের পাঠকদের প্রতিনিধি হিসেবে 'পাবলিক এডিটর' রয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *দি লুইভিলে টাইমস* ১৯৬৭ সালের জুনে প্রেস ওমবুডসম্যান নিযুক্ত করে আর কানাডায় নিযুক্ত করে *দি টরেন্টো স্টার* ১৯৭২ সালে।

বিভিন্ন দেশের মূলত সাংবাদিকতা পেশার মান ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবাদ ন্যায়পাল এর কার্যক্রম চালু হয়েছে কিন্ড্ু প্রত্যেক দেশেই ন্যায়পাল দপ্তরের কার্যক্রম অনন্য সাধারণ, একটি দেশের সঙ্গে অপর দেশের কার্যক্রম এবং প্রেক্ষাপটের খুব বেশি মিল নেই। যখন দেখি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য ও ঘৃণা ছড়ানো বক্তব্য দেয়া (discrimination and the hate speech) নিয়ে যেমন বিশেষ নজরদারি রয়েছে তেমনি আয়ারল্যান্ডে 'কোড ব প্র্যাকটিস' এ 'প্রিজুডিস' (prejudice) পর্যায়ে বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি সম্পর্কে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংবাদ ন্যায়পালের দায়িত্বপালনের বিধান হিসেবে নীতিমালা অনুসরণের কাঠামো দেখা যায়। বাংলাদেশে এই প্রথম একটি সংবাদপত্র তাদের পেশাগত উৎকর্ষ ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবাদ ন্যায়পাল নিযুক্ত করেছে। সংবাদ ন্যায়পালের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংবাদ ন্যায়পালের কার্যালয়কে কার্যকর করা। দপ্তর থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সংবাদ ন্যায়পাল এর দপ্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে গত পহেলা জানুয়ারি ২০১১ থেকে পায়লা জুন ২০১১ পর্যন্ড় ১০টি প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে সংশি ষ্ট ১৪ জন সাংবাদিককে তলব কিংবা লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। প্রতিটি সংবাদকে ভিন্ন প্রকরণে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, এবং ভিন্ন অভিযোগে সংশি ষ্ট সাংবাদিককে তলব বা তাদের বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচনা ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সুরাহা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাংবাদিককে সতর্ক করা হয়েছে; ভবিষ্যতে এমন ভুলত্র"টি এড়ানোর

উপদেশ দেয়া হয়েছে।

সংবাদ ন্যায়পালের কার্য নির্বাহে সাধারণভাবে সাংবাদিকতার নীতিমালা ও পেশার শিক্ষাগত ও প্রায়োগিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে। সংবাদে রিপোর্টারের নিজস্ব মতামত দেওয়া পরিহার করে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকরা এ সকল উপদেশ ও আলোচনা গুর"ত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সন্ড়ুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

উলে খ করা যেতে পারে যে, সংবাদ ন্যায়পালের স্বপ্রণোদিত এই কার্যক্রমের পূর্বে *আমাদের সময়* হাউসের সাংবাদিকদের সাথে কয়েকটি বৈঠকে সংবাদপত্রের মানকে উন্নত ও পেশাকে জবাবদিহি করার গুর"ত্ব আলোচনা করা হয়। অতঃপর সংবাদ ন্যায়পাল প্রবর্তন ও কাজের পরিধি নির্ধারন করার লক্ষ্যে কয়েকজন দৈনিকের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদকের সঙ্গে দুই দফায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সে সভায় দিক নির্দেশনাকারী গুর"ত্বপূর্ণ মতামত বেরিয়ে আসে। সাংবাদিকদের জন্য অবশ্য পালনীয় নীতিমালা তৈরীর প্রস্ড়াব আসে সে সকল আলোচনা সভায়।

খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং সেগুলো ইনহাউস সাংবাদিকদের মধ্যে দু'দফায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এই নীতিমালা নিয়ে সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ড়ভাবে গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে। এই নীতিমালার আলোকে সংবাদ ন্যায়পালের দপ্তরের কার্যাবলি পরিচালিত হতে পারবে। এই নীতিমালা ভঙ্গের কারণে সংবাদপত্রের সংশি ষ্ট সাংবাদিককে জবাবদিহি হতে হবে। এতে করে পেশার উন্নতি হবে; পাঠকদের অধিকার নিশ্চিত হবে; এবং সর্বোপরি *আমাদের সময়*-এ জবাবদিহিতামূলক সাংবাদিকতা বজায় থাকবে। এতে করে দেশের সার্বিক সাংবাদিকতার নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

তবে সংশয়ের যে সুযোগ নেই তা নয়। যদি সংবাদ ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তা হলে কী হবে? কিংবা সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী বা সম্পাদক অথবা অপর সংবাদপত্রের সঙ্গে এই সংবাদপত্রের সম্পর্ক যদি দ্বন্দমূলক কোন অবস্থায় (conflict of interest) পৌঁছায়, তা হলে কী হবে? এ সকল প্রশ্নের পাশাপাশি আশার কথা হচ্ছে, সংবাদপত্রের এ সকল আলোচনা-পর্যালোচনা গণমাধ্যমের পেশায় নতুন প্রতর্ক (discourse) অবতারণা করবে। সংবাদ ন্যায়পালের ইতিবাচক ভূমিকা পেশায় মেন্টরিং (mentoring) এর ভূমিকা পালন করবে। সংবাদ ন্যায়পালের দপ্তর ব্যক্তির উর্ধে থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।

আমরা আশায় বাঁচতে চাই। উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল হোক আমাদের প্রত্যাশা।

Md. Golam Rahman, PhD: Professor, Dept. of Mass Communication, University of Dhaka

“‘বিশ্বস্তসূত্রে’, ‘গোপনসূত্রে’ লিখতে লিখতে দুই হাতের দশ আঙ্গুল পঁচাইয়া ফেললাম...হে হে হে...”

কাবেরী গায়েন

এটি কোনো নাটক বা সিনেমার সংলাপ নয়। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ রাতে বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক-শো'র সম্মানিত অতিথি, যিনি কেবল একজন মামুলি সাংবাদিক নন, সাংবাদিকদের একটি সংগঠনের নির্বাচিত কর্ণধার, প্রায় প্রতিরাতে যার উপদেশ, পরামর্শ শুনে দেশবাসী ঘুমাতে যান, এমন একজন সাংবাদিকনেতার সহাস্য বিজয়-ঘোষণা এটি। তিনি বললেন, যুক্তরাজ্যের সাংবাদিকতার নীতিমালার সাথে বাংলাদেশকে তুলনা করলে হবে না, আমরা আমাদের নিয়মে চলি। এখানে বিশ্বস্তসূত্র, গোপনসূত্রের বরাতে সংবাদ লিখে তিনি না কি দুই হাতের দশ আঙ্গুল পঁচিয়ে ফেলেছেন। একথা বলে শুধু আত্মতৃপ্তির হাসিই হাসেননি তিনি, সেই বিখ্যাত দশ আঙ্গুল দেখিয়েও দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য সেই বিখ্যাত দশ আঙ্গুলের বেশ কয়েকটিই অঙ্গুরী-শোভিত ছিলো। সেরাতের দর্শক যারা ছিলেন, তারা মোহিত হয়েছেন নিশ্চয়ই সেইসব অঙ্গুরী-শোভিত আঙুল দেখে। তিনি এত নিশ্চিত এবং বিজয়ীভঙ্গিতে হাসি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন টেলিভিশনের পর্দা আর দেখিয়েছেন বিজয়ী আঙুলসমূহ যে, তুখোড় উপস্থাপকও ধন্ধে পড়ে গেছেন হয়তো, ফলে এই বিষয় নিয়ে আর ঘাঁটাতে চাননি। সেরাতের টক-শোতে এই সাংবাদিকনেতার নিরঙ্কুশ জয় হয়েছে। কিন্তু, তাঁর সেই হাসিমাখা আত্মতৃপ্ত বিজয়ীমুখ সাংবাদিকতার পরাজয়বার্তা ঘোষণা করেছে বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। বিষয়টি সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী মাত্রের কাছেই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণও বটে। একেবারে মূলে টান। সাংবাদিকতা বিভাগে বারে বারে শিখতে হয়েছে প্রপাগান্ডার সাথে, প্রচারণার সাথে সংবাদের পার্থক্য সূচিত হয় তথ্যসূত্রের যথাযথ প্রয়োগ প্রসঙ্গে। এমনকি ‘হ্যান্ডলিং নিউজ সোর্স’ পড়তে গিয়ে আমরা জানি, প্রয়োজনে একটি সংবাদকাহিনী হারানো যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই সংবাদসূত্রকে না জানিয়ে কোনো সংবাদ করা যাবে না, ইত্যাদি। কাজেই আমাদের বিভাগ যখন তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে, অর্থাৎ পার করছে তার গৌরবের পঞ্চাশ বছর, তখন এই প্রাথমিক হিসেব নিয়ে বসতেই হচ্ছে, ‘বিশ্বস্তসূত্র’, ‘গোপনসূত্র’-সমূহের বরাতে যেসব খবর ছাপা হয়, সেসব আদৌ খবর হয় কি না কিংবা এসব সংবাদসূত্রের বরাতে লেখা ‘সংবাদ’ লিখে ‘পঁচাইয়া ফেলা’ দশ আঙুলের প্রদর্শন আসলেই এতটা

গৌরবের ব্যাপার কি না বুঝে নেবার জন্য। এসব সাংবাদিক নেতার কাছেই আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা চাকরি করতে যান কোনোরকমে প্রথম বর্ষটা পার করে এবং সেখানে গিয়ে এই জাতীয় মন্তব্য শোনার পরে বই-এর পাঠ যে ফালতু কিছু সে বিষয়ে গভীর আস্থা অর্জন করে ফেলেন সন্দেহ নেই। তাই আলোচনাটি জরুরি।

আমি রাম-গরুড়ের ছানা নই, হাসতে আমি জানি। হাসির কথা শুনলে হাসতে ভালো লাগে। মুশকিল হলো, আলোচনাটি কোনো হাস্য-কৌতুক প্রতিযোগিতার বিচার-সংক্রান্ত ছিল না, হাস্য-কৌতুক প্রদর্শনের জন্যও ছিল না, বরং ছিল খুবই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ, ভাব-গম্ভীর একটি বিষয়ে। এই টক-শো অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সম্মানিত প্রধান বিচারপতি নিজামুল হক এবং বেলজিয়ামে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক অপরাধ-আইন বিশেষজ্ঞ ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিনের মধ্যে যে কথাবার্তা স্কাইপি হ্যাকিং-এর সূত্রে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের একটি পত্রিকা কোনো তথ্যসূত্র ছাড়াই, সাংবাদিকতার অ্যাকাডেমিক এথিকস-এর দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিষয়টিকে কীভাবে দেখা যায়, কথা হচ্ছিলো সেই প্রসঙ্গে। ততদিনে বিচারপতি নিজামুল হক পদত্যাগ করেছেন। ষোলই ডিসেম্বরের আগেই বিচারাধীন মামলাগুলোর এক-আধটি রায় হয়ে যাবার ব্যাপারে জাতির যে প্রত্যাশা ছিলো, সেসব প্রত্যাশা তখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে পরিবেশটি ঠিক তামাশা করার মতো ছিলো না।

প্রশ্ন এখানে দু'টি। প্রথম প্রশ্ন, দুইজন ব্যক্তির মধ্যকার ব্যক্তিগত কথোপকথন হ্যাক করে পাওয়া তথ্যকে প্রকাশ করা কতখানি সাংবাদিকতা-সুলভ? এই প্রশ্নটি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে আমাকে করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আসলেই 'বিশ্বস্ত সূত্র', 'গোপন সূত্র'-র বরাত দিয়ে সংবাদ লেখা যায় কি না। সাংবাদিক নেতার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আমার। প্রশ্ন দুটি আন্তঃসম্পর্কিত এবং প্রেক্ষাপটও একই ঘটনা দিয়ে উদাহরণ দেবার মতো অনুকূল।

ইকনোমিস্ট কিন্তু এখনো কথোপকথন ছাপায়নি!

তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার যেমন স্বীকৃত সারা পৃথিবীতে, তথ্য চুরি করা ততটাই বে-আইনি বা বলা ভালো সূত্র উলে খ না করেই সেই তথ্যকে প্রকাশ করা বে-আইনি। বাংলাদেশের এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি অন্য একজন যুদ্ধাপরাধ আইন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে, স্কাইপিতে। সেই কথোপকথন চুরি হয়েছে। অর্থাৎ কেউ চুরি করেছেন বা দুই পাশের কথোপকথনে নিয়োজিত দুই ব্যক্তির কারো কাছ থেকে কথা হ্যাক হতে পারে, এমন অভিযোগও উঠেছে। বাংলাদেশের একটি ওয়েবসাইট প্রথম জামাত-পন্থী একটি ফেসবুক গ্রুপে এই রেকর্ডের বিষয়ে জানতে পারে (Datta, 2012)। এবং সেটি লন্ডনভিত্তিক *দ্য ইকোনমিস্ট* এসংক্রান্ত খবর ছাপানোর বা ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণের আগেই। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধানকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কীভাবে তারা এই দুই বিচারপতির মধ্যকার কথোপকথনের এবং ই-মেইলের রেকর্ড জোগাড় করলেন, সে বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব দেবার সমন পাঠানোর পরিপ্রেক্ষিতে ৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে তারা জবাব হাজির করেন *দ্য ইকোনমিস্ট*-এ। এবিষয়ে তীব্র তোলপাড় শুরু হলে বিচারপতি হক পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশের একটি দৈনিকে দুজন বিচারপতির একেবারে ঘরোয়া ভঙ্গিতে দিনের পর দিন আলাপচারিতা পত্রিকায় ছাপানো হয়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আড়িপাতাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন ব্যারিস্টার শাহদীন মালিক। তাঁর মতে, বেআইনি কাজ করে তারা একটি আইনি প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন মাত্র। ড. জাকির হোসেন বলেছেন, ব্যক্তিগত আলোচনাতে আড়িপাতার অপরাধকে প্রাইভেসি ক্ষুণ্ন করা ছাড়াও সাইবার ক্রাইমের আওতায় বিচারাধীন করা যায়।

দ্য ইকোনমিস্ট ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে কিন্তু উলে খ করেনি, কোথায় তারা এসব হ্যাক-করা কথোপকথনের রেকর্ড পেয়েছে, কীভাবেই বা ই-মেইল পেয়েছে। তবে *দ্য ইকোনমিস্ট* স্বীকার করেছে টেলিফোন কথোপকথনের ১৭ ঘণ্টার রেকর্ড তারা শুনেছেন এবং এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় হয়েছে এমন ২৩০টি ই-মেইল তারা দেখেছেন। তারপর তারা *[দ্য ইকোনমিস্ট]* পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন,

> এসব বিষয়বস্তু খুবই গোপনীয় এবং আমরা আইন ও ব্রিটিশ *প্রেস কোড অব কন্ডাক্ট* দিয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এজাতীয় তথ্য আমরা প্রকাশ করতে পারি না যদি না বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের ব্যাপার হয়ে থাকে।

এরপর পত্রিকাটি তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে:

> এই ই-মেইলগুলো, যদি সত্য হয়, কোর্টের কার্য-প্রণালীকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং আমরা যতটা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব তদন্ত করে দেখতে বাধ্য। এই তদন্তের প্রয়োজনেই আমরা ওই দুই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।

তাদের তদন্ত তখনো চলছে জানিয়ে তারা বলেন,

> তদন্ত শেষ হলে এবং যদি আমাদের বিবেচনায় এসব অভিযোগের সারবত্তা আছে বলে মনে হয়, আমরা তখন সেসব প্রকাশ করবো।

তদন্ত তাদের শেষ হয়েছে কি না জানা যায়নি, কিন্তু তারা এখনো ছাপেনি কথপোকথন। কেন ছাপেনি? কারণ *ব্রিটিশ প্রেস কোড অব কন্ডাক্ট*-এ পরিষ্কার বলা আছে, কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠান গোপন ক্যামেরায় বা কারো মোবাইল বা ই-মেইল হ্যাক করে পাওয়া তথ্য কোনোভাবেই ধারণ করে রাখতে পারবে না বা প্রকাশ করতে পারবে না।

সন্দেহের অবকাশ নেই যে কোনো সংবাদপত্র বা সাংবাদিক যেকোনো বিষয়ে রেকর্ড বা অন্যান্য প্রমাণ হাতে এলে বা সেসব তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার সময় তার ব্যাখ্যা চাইতেই পারে সংশি ষ্ট ব্যক্তিদের কাছে। প্রাপ্ত তথ্য 'জনগণের স্বার্থে' প্রকাশও করতে

পারে। কিন্তু তার অর্থ কী এই যে, কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান বা সাংবাদিক যেকোনো উপায়ে পাওয়া রেকর্ডকে ধারণ করতে পারে? আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করলে, হ্যাকিং-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ব্যাখ্যা চাওয়া বা কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সেই রেকর্ডের ভিত্তিতে ভয় দেখানো কতটুকু নৈতিক বা সাংবাদিকসুলভ?

আর এই পয়েন্টে *দ্য ইকোনমিস্ট* ব্রিটিশ *কোড অব কন্ডাক্ট অব প্রেস*-কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে অংশত। ব্রিটিশ *এডিটরস' কোড অব প্রাকটিস* অনুযায়ী, হ্যাক করে পাওয়া কোনো তথ্যের রেকর্ডও রাখতে পারবে না কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান।

২০১১ সালের ডিসেম্বরে *দ্য ব্রিটিশ প্রেস কমপ ায়েন্টস কমিশন* ফের এই কোডকে ঝালাই করেছে। এই কোডের ১০ নম্বর উপ-ধারায় *ক্লান্ডেসটাইন ডিভাইসেস সাবটারফিউজ* উপশিরোনামে বলা হয়েছে:

> অর্থাৎ, কোনো গোপন ক্যামেরা বা শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে; বা কোনো ব্যক্তিগত বা মোবাইল টেলিফোনের কথপোকথনে ঢোকার মাধ্যমে; ...অথবা অনুমতি ছাড়াই কোনো ডিজিটাল উপায়ে ধারণ করা কোনো তথ্যে প্রবেশ করে কোনো প্রেস কোনো তথ্য ধরে রাখতে পারবে না বা প্রকাশ করতে পারবে না (অনুবাদ লেখকের)।

দ্য ইকোনমিস্ট এই বিধানে ঝুলছে। যদিও ট্রাইব্যুনালকে ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে 'জনগুর ত্বপূর্ণ' মনে করলে তারা তথ্যগুলো ছাপিয়ে দেবে, কিন্তু এখনো যে ছেপে দিতে পারেনি তার কারণ হলো ব্রিটিশ প্রেস আইন এই হ্যাক করে পাওয়া তথ্যকে প্রকাশের অনুমোদন দেয় না। আবার যুদ্ধাপরাধীদের দায়ে অভিযুক্ত বিচারাধীনদের বাঁচানোর বিষয়টিকে খুব বেশি জনগুর ত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ করাও দুরূহ। সবচেয়ে দুরূহ বোধহয়, এই দুই আইনজীবীর কথোপকথনে খুব যে বেশি এই বিচার প্রক্রিয়ার বির দ্ধে যায় এমন কথা আছে, সেটি প্রমাণ। ফলে *দ্য ইকোনমিস্ট* এখনো কিছু প্রকাশ করেনি। কিন্তু যে *কোড অব কন্ডাক্ট* -এর নিগড়ে বাধা *দ্য ইকোনমিস্ট*, সে-জাতীয় কোনো নৈতিকতার বালাই নেই আমাদের দেশে, সাংবাদিকতার নীতিমালাই নেই তাই হ্যাকিং-এ পাওয়া কথোপকথনকে আমাদের দেশের সংবাদপত্র ছেপে দিয়েছে সূত্র উলে খ না করেই।

অথচ হ্যাকিং-এ পাওয়া তথ্য ছাপানোর হ্যাপা কী হতে পারে তার কিছু উদাহরণ না দিলে এই হ্যাকিং-এর শাস্তিযোগ্য অপরাধমূলক অংশটি আমাদের অজানাই থেকে যাবে। আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না *নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড* কেসটি। যেসব ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছেন, তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত মোবাইল হ্যাক করার ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে এই সর্বোচ্চ বিক্রিত ১৫০ বছরের ট্যাবলয়েডটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিরোধী দলের নির্বাচনী অফিসে আড়ি পাতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তো স্রেফ ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর দায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়। গত দশকের মাঝামাঝি *নিউজ কর্পোরেশন*-এর হ্যাকিং স্ক্যান্ডাল যা হ্যাকগেট, র পার্টগেট, মারডকগেট নানা নামে পরিচিত, পদত্যাগ করেছেন *নিউজ ইন্টারন্যাশনাল-এর লিগ্যাল ম্যানেজার* টম ক্রাউন, *নিউজ ইন্টারন্যাশনাল*-এর প্রধান নির্বাহী রেবেকা ব্র ক এবং লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার স্যার পলস

স্টিভেনসনকে। পদত্যাগ করতে হয়েছে মিডিয়া টাইকুন *নিউজ কর্পোরেশন*-এর প্রধান স্বয়ং র পার্ট মারডককে।

আর এসব দেখে, অর্থাৎ সাংবাদিকতার নীতিমালা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবার জন্য ব্রিটিশ বিচারপতি ব্রায়ান লেভিসন প্রেসকে নিয়মনের মধ্যে আনার জন্য একটি স্বাধীন গ্র পের সুপারিশ করেছেন 'যারা আইন দ্বারা সমর্থিত থাকবে এবং যাদের জরিমানা করার অধিকার থাকবে'। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন একটি নতুন, শক্তিশালি, স্বাধীন প্রেস নিয়ামক গঠনের জন্য তিনি বিচারপতি লেভিসনের সুপারিশকে সমর্থন করেন।

এ তো গেল ব্রিটিশ প্রেসের কথা। সেই সাংবাদিক নেতার মতো অনেকেই বিরক্ত হতে পারেন কেবল ব্রিটেনের কথা বললে। হ্যাকিং স্ক্যান্ডালের শাস্তি অন্যান্য দেশে কেমন, সেদিকও একটু দেখে নেয়া যাক। ২০০৪-২০০৫ সালের গ্রিক ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির কথা মনে আছে হয়তো অনেকেরই – ভোডাফোন গ্রিস নেটওয়ার্ক ট্যাপিং হয়েছিল, মূলত সরকারি কর্মকর্তাদের ফোন ট্যাপ করা হয়েছিল। এই ট্যাপিং কেলেঙ্কারি প্রমাণিত হলে ভোডাফোন কোম্পানিকে শুর তেই জরিমানা করা হয়েছিলো ৭৬ মিলিয়ন ইউরো, পরে প্রতি ইন্সটলমেন্টে আরো বেশি জরিমানা দিতে হয়েছিলো। ১৯৮৩ সালে আইরিশ ফোন ট্যাপিং-এর কথা বলা যায়। ফিয়ানা ফিইলের সরকার সাংবাদিকদের ট্যাপ করেছিল। ন্যায়বিচার বিষয়ের মন্ত্রী এই ট্যাপিং-কে অনুমোদন করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্লস হহিকে এই ঘটনার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। এমন আরেকটি স্ক্যান্ডাল ২০০৬ সালে ইতালিতে, SISMI টেলিফোন কোম্পানির। সামরিক ইন্টেলিজেন্স গ্র প ৫০০০ মানুষের টেলিফোন ট্যাপ করেছিলো। SISMI টেলিফোন কোম্পানির দ্বিতীয় প্রধান কর্মকর্তা মারিও ম্যানচিনি ও ডিটেকটিভ ইমানুয়েল সিপ্রিয়ানিকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারতের টাটা ট্যাপ কেলেঙ্কারির কথা বলতে হয়। দেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের টেলিফোন ট্যাপিং-এর অভিযোগ প্রমাণিত হলে সিনিয়র ম্যানেজার ব্রজেন গগারকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলো। উদাহরণ আর না বাড়াই। পৃথিবীর সব দেশেই ট্যাপিং, হ্যাকিং শুধু নিষিদ্ধ নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর হ্যাকিং-এ পাওয়া তথ্যকে সংবাদ হিসাবে বিক্রি করা? সাংবাদিকতার নামে নয়।

নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে *বাংলাদেশ প্রতিদিন*

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বোধহয় পাওয়া যায় *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকায় গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রকাশিত এই সংবাদে। এই সংবাদে বলা হয়েছে:

> মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের 'কাল্পনিক দিন' উলে খ করে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২-এ নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে। ট্রাইবুনাল ওই আবেদন গ্রহণ করেন এবং রায় নিয়ে কল্পনাপ্রসূত প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেন। বিচারপতি

ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইবুনাল-২-এ আজ 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর পক্ষের আইনজীবি ইউসুফ খান প্রতিবেদনটি প্রকাশের বিষয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করেন। পরে ট্রাইবুনাল আবেদনটি গ্রহণ করে ওই আদেশ দেন।

'বাংলাদেশ প্রতিদিন' কীভাবে সংবাদসূত্র বিষয়ে ঝামেলা করেছিলো সেদিকে একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাবো এই অপকর্মটি কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল। মূলে ছিল সংবাদসূত্রের ঝামেলা। ৩ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতায় 'বিজয় দিবসের আগেই সাঈদীর মামলার রায়' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল ার বির"দ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের 'কাল্পনিক দিন' উলে খ করা হয়। 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়,

> ট্রাইবুনাল-সংশি ষ্টদের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে, ১৩ ডিসেম্বর সাঈদীর মামলাটির রায় হতে পারে। পরদিন ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এর একদিন পরই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। বিজয়ের মাসেই অপর অভিযুক্ত গোলাম আযম ও কাদের মোল ার মামলারও রায় হতে পারে। ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কাদের মোল ার বির"দ্ধে মামলার রায় আসতে পারে। গোলাম আযমের মামলার রায়ও ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।
>
> [গুর"ত্ব বোঝানোর জন্য উদ্ধৃত অংশের আন্ডার-লাইন লেখকের]

এতবড় একটি খবরের সংবাদসূত্র হলো প্রতিবেদকের ট্রাইব্যুনাল-সংশি ষ্টদের মধ্যে গুঞ্জন, এই বাক্যাংশটুকু। এইটুকুই। আর এইখানেই যত সমস্যা। এতবড় ডাঁহা কাল্পনিক খবরটি তারা দিয়েছেন যথাযথ সূত্রের উলে খ ছাড়াই। এই অপরাধেই তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হয়েছে। নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার সংবাদটি যখন প্রকাশিত হয়, ১৯ ডিসেম্বর, তখন আমি দেশের বাইরে। সংবাদটি *প্রথম আলো*র অনলাইন সংস্করণে পড়তে পড়তে মনটা আনন্দে ভরে যায়। সাংবাদিক নেতা যা-ই বলুন, 'বিশ্বস্ড় সূত্র', 'গোপন সূত্র' কিংবা 'ট্রাইবুনাল সংশি ষ্টদের মধ্যে গুঞ্জন' জাতীয় সূত্রের বরাত দিয়ে লিখলে আমাদের দেশেও নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দিন শুর" হয়েছে।

এই আনন্দ স্থায়ী হয় যখন কেন মেজলার-এর *নিউজ গ্যাদারিং ও রাইটিং* থেকে শুর" করে আমাদের সেমিনারে রিপোর্টিং বিষয়ে যত বই আছে সব বইতেই পড়তে থাকি সংবাদসূত্রের স্পষ্টতা এবং গুর"ত্ব নিয়ে লেখা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পড়ি আরেকবার। এই সুযোগে ফের ঝালিয়ে নেয়া হলো পুরনো পড়া।

মজার ব্যাপার হলো, এই সাংবাদিক নেতা, যিনি আমাদের বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র, বড় ভাই ওই অনুষ্ঠানে এবং বহু অনুষ্ঠানেই বলেছেন যুদ্ধাপরাধের বিচার তিনি চান কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া হতে হবে আন্ড়র্জাতিক মানের। যুদ্ধাপরাধের বিচার চান অন্ড়র্জাতিক মানের, কিন্তু সাংবাদিকতা করতে চান তাদের নিয়মে, দেশীয় কায়দায়। আঙ্গুল পঁচে যাওয়া কায়দায়। হায়!

কিন্তু ফের ধন্ধ লেগে যায় মনে। আসলেই কি আমাদের দেশে 'বিশ্বস্ড় সূত্রে', 'গোপন সূত্রে' লেখাটাই দস্তুর? অতঃপর দ্বারস্থ হই বন্ধু ও সহকর্মী জনাব সাইফুল আলম চৌধুরীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে *নিউজ গ্যাদারিং অ্যান্ড রাইটিং* কোর্সটি পড়ানোর দায়িত্বে রয়েছেন তিনি এবং দীর্ঘদিন কাজ করেছেন মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমে। তিনি দিয়েছেন আমাকে একটি তালিকা যা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংবাদ লেখার সময় প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলার জন্য ব্যবহার করা হয়। তিনি এই তালিকার নাম দিয়েছেন *কিছু অজ্ঞাতনামা সোর্স: প্রতিনিয়ত যা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন*। এই তালিকাটি তিনি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করেন। তাঁর তালিকায় মোট চৌদ্দটি তথাকথিত সংবাদসূত্রকে প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে আর সেগুলো হলো: ১। 'অফ দ্য রেকর্ড' ২। 'বিশ্বস্ড়সূত্র' ৩। 'সংশিষ্ট সূত্র' ৪। 'অভিজ্ঞ মহল' ৫। 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' ৬। 'বিশেষজ্ঞদের ধারণা' ৭। 'এলাকাবাসীর মতে' ৮। 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ' ৯। 'জানা গেছে' ১০। 'খোঁজ নিয়ে জানা গেছে' ১১। 'সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে' ১২। 'অনেকের মতে/ অনেকে মনে করেন' ১৩। 'সচেতন লোকজন/সাধারণ মানুষ মনে করেন' ১৪। 'ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন'।

তাহলে, আমাদের দেশেও দুই হাতের দশ আঙ্গুল 'বিশ্বস্ড় সূত্রে', 'গোপন সূত্রে'-র দোহাই দিয়ে লিখে পঁচিয়ে ফেলাটা নিয়ম নয়, কেউ কেউ এই অপকর্মটি করেন এবং আমার বিশ্বাস তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। আর এই অপকাজের বিজয়গাঁথা জাতির সামনে হাস্যোজ্জ্বলমুখে তুলে ধরার মতো সাংবাদিক যে অনেক বেশি নেই আমাদের দেশে, সেই বিশ্বাসটিও আছে।

দিন সত্যিই পাল্টাচ্ছে। গোপনসূত্রে, বিশ্বস্ড় সূত্রে, সংশি ষ্টদের গুঞ্জনে মার্কা তথ্যসূত্রের বরাতে যে আর সংবাদ লেখা যাবে না সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এর নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়েই সেই যুগের শুর" হলো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। একে বলে জবাবদিহিতার সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার সাথে দায়িত্বশীলতা থাকলেই এই অনর্থগুলো ঘটে না। সাগর-র"নি হত্যাকান্ডের পরেও বেশ কিছু জাতীয় দৈনিকে দেখেছিলাম সূত্রহীন, দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা। এই দায়িত্বহীনতা দেখা গিয়েছিলো বিডিআর বিদ্রোহের রিপোর্টিং-এ। তাই মনে হয়, নিয়ন্ত্রণের (control) জন্য নয়, নিয়মনের (regulation)-এর জন্য একটি গণমাধ্যম নীতিমালা দরকার।

তারপরও ধন্য মানি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগটি চালু হয়েছিলো বছর পঞ্চাশেক আগে। ভুল-শুদ্ধের মারামারি আর বাহাসের ভেতর থেকে সত্যিটাই চিনে নেবে সামনের দিনের সাংবাদিকতা, সে ভরসা করতে ইচ্ছে করে। আমরা হারি ক্ষতি নেই, সাংবাদিকতাকে জিতিয়ে কি দিতে পারি না আমরা?

বর্তমান এবং আগামী দিনের সাংবাদিকদের কাছেই আমার যত প্রত্যাশা। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, 'আমার একদিকে বন্ধন, আরদিকে মুক্তি'। দায়িত্বশীলতা যদি হয় বন্ধন, মুক্তি হলো সত্য-নির্ভিক সাংবাদিকতা। জয় হোক সত্য সাংবাদিকতার। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জয় হোক।

তথ্যসূত্র

Datta, Polash. 2012. "The Economist violates the British press codes." E-Bangladesh. http://www.ebangladesh.com/2012/12/10/the-economist-violates-the-british-press-code/

Editors' Code of Practice. Press Complaints Commission. http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html

প্রথম আলো। ২০১২। "বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা"। http://prothom-alo.com/detail/date/2012-12-19/news/314497

কাবেরী গায়েন: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে প্রসারমান মিডিয়া-সংস্কৃতি

আ-আল মামুন

আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে, আমার ছোটবেলা কেটেছে কুষ্টিয়া শহরকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী এক গ্রামে। সন্ধ্যা হলেই প্রতিদিন বাড়ির কাছারিতে গ্রামের দু-দশজন মুর"্বি, মাঝবয়সী প্রতিবেশী আর ছেলে-ছোকরা এসে জড়ো হতো। তারা গল্পগুজব করতো, গান গাইতো। আমরা ঘুমোতে যেতাম চাঁদ বা তারার আলোয় উঠোনে বসে তাদের গাওয়া কেচ্ছা, জারী আর কবিগান শুনে। নিয়মিতই সকালে-দুপুরে মাঠের ক্ষেতের কাজে মগ্ন কামলা ও কৃষকের সমবেত কণ্ঠের গান অবাধ বাতাসে ভেসে বেড়াতো, আর সন্ধ্যার পরে দূরগামী ক্লান্ড় একলা পথিকের নিঃসঙ্গ গান বা বাঁশির সুর আমার পড়ার টেবিলে হানা দিত। মাসে-চাঁদে বাড়িতে বাউল-ফকিরদেরও ডাকা হতো গানের আসর করতে – নূরতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, দেহতত্ত্বের সেসব গান না-বুঝেও আমরা ছোটরা সুরের আবেশে গভীর রাত পর্যন্ড় জেগে বসে থাকতাম। রেডিও ছাড়া আর মিডিয়া-যন্ত্র তখন গ্রামে বিশেষ দেখা যেত না। কোনো বনেদি বাড়িতে যদি টেলিভিশন থাকতো তো চারপাশের গ্রামের নারী-পুর"ষ-শিশুর ঢল নামতো সেখানে। বিকেল থেকে মাঝরাত পর্যন্ড় তখন কেবল বিটিভির সম্প্রচার পাওয়া যেত সেই টেলিভিশনে। ব্যাটারিতে চালাতে হতো বলে সপ্তাহের নাটক বা ঈদের অনুষ্ঠানের বেশি কিছু দেখবার বিলাসিতা কেউ করতো না। আর সেই অনুষ্ঠানগুলো দেখানোর বন্দোবস্ড় হতো উঠোনে বা খোলা মাঠে। সাত কিলোমিটার দূরের কুমারখালী শহরে একটা সিনেমা হল ছিল। *রূপবান* বা এইরকম সাড়া-জাগানো কোনো সিনেমা থাকলে গ্রামের হাটে হাটে পোস্টার লাগতো, আর মাইকে চলতো প্রচারণা। এই সময়টায় গ্রামে ক্যাসেট-পে য়ার আমদানি হতে শুর" করে। কারো কাছে, বিশেষত যৌতুক হিসেবে পাওয়া, ক্যাসেট পে য়ার থাকলে সারা বছর এপাড়া-ওপাড়া, এ-গ্রাম-সে-গ্রামে তার বায়না লেগেই থাকতো। সন্ধ্যার আগেই সেই সৌভাগ্যবান দু'একজন সঙ্গীসহ ক্যাসেট-পে য়ার, বড় ব্যাটারি আর অনেক রেকর্ডেড ক্যাসেট সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে রওনা দিতো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ক্যাসেট-মালিক ও তার সঙ্গী-সাথীদের ভালোমন্দ খাওয়ানো হতো, আর বিনিময়ে দশবাড়ির লোক একসাথে বসে মাঝরাত পর্যন্ড় রেকর্ডের গান শুনতো, কাহিনী শুনতো, কখনো ওয়াজ-নসিহতও চলতো। এটা হলো সেই সময় যখন বাংলাদেশে ক্যাসেট পে য়ারের সুবাদে গানের জগতে মমতাজ, আর বিশ্বাসীদের জগতে সাঈদীর অধিষ্ঠান ঘটতে থাকে।

বছর কুড়ি বাদে, এখন আমি পাকা সড়ক ধরে সোজা বাড়িতে পৌঁছে যাই। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। কুষ্টিয়া শহরটিকে আর দূরের মনে হয় না, গ্রাম ও

শহরের ব্যবধান ঘুচে গেছে অনেকটাই। যাতায়াত ব্যবস্থার এই উন্নতির চেয়েও চোখে পড়ে গ্রামের মানুষের অভ্যাস, জীবন-জীবিকা আর সম্পর্কসূত্রের রূপান্ড়র - পাকা সড়কের ভূমিকা সেখানে সামান্যই। এখন ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে, আর বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি অনেক চ্যানেলের টেলিভিশন চলে হরদম। গ্রামে ঢুকতেই দেখতে পাই অনেকগুলো দোকান বসেছে। তার সামনে সারি সারি আসন পাতা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তো বটেই, এবং বিকেল হলেই সব কাজকর্ম সেরে আজকের চাষীরা হাত-পা ধুয়ে 'ভদ্দরলোক' সেজে জড়ো হয় মাঝরাত অব্দি আড্ডা দিতে। চা-পানের দোকানগুলোতে চলতে থাকে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের চ্যানেলগুলো, কিংবা ঢাকার বা কলকাতার কোনো বাংলা ছবি। ভিন্নতর ও স্বপ্নময় দূরদেশী জীবন, জাতীয় জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-সঙ্কট-রাজনীতি এবং লোভনীয় পণ্যের মদির আহ্বানে তারা মশগুল হয়। গিন্নী-বউরা সিনেমা আর সিরিয়াল-নাটক দেখে পরিবার ও সমাজে তাদের ভূমিকাটি রপ্ত করে নেয়; বিজ্ঞাপন দেখে ছেলে-মেয়ে, নিজের ও পরিবারের জন্য পণ্য কেনার ফরমায়েশ করে। সামর্থ্যবান সবার হাতেই আছে মোবাইল ফোন, এমনকি বাড়ির বউ-গিন্নীদের হাতেও। আর, সেই মোবাইল ফোনে নৈমিত্তিক প্রয়োজন ও সামজিক যোগাযোগের চাহিদা পূরণের বাইরেও, ভাব-ভালোবাসা-অভিমান-ঝগড়া-বিবাদ চলে; হরেক রকম ফটো তোলা, ভিডিও করা ও দেখা, গান শোনা সবই সম্ভব হয়ে ওঠে। যুগের হাওয়ায় পাল তুলে বর্তমান সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামের যে নির্বাচনী অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ করেছিল তার প্রদর্শনী হিসেবে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র অত্যন্ড় বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যর্থ সংযোজন হলেও গ্রামের মানুষের জীবনে আজ ইন্টরনেট খুব দূরের বস্তু নয়, তা এখন অনেক প্রয়োজনেরও নিদান। স্বচ্ছল পরিবারের উঠতি ছেলেমেয়েরা এখন হাতের মোবাইল ফোনটায় গান ডাউনলোড করে, ভিডিও ডাউনলোড করে, ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলে, রাত-বিরাতে স্কুলের পড়া ফেলে প্রেমালাপ করে; আর উৎসবে-অনুষ্ঠানে নাচগানের আয়োজন করে - সাউন্ডবক্সে হালফ্যাশনের কোনো হিন্দি বা কলকাতার বাংলা গানের সাথে দুরূহ শরীরি কসরতবহুল নাচটি তারা হুবহু নেচে দেয়।

কীভাবে পাঠ করবো এই পরিবর্তিত জনজীবনকে? গ্রামসমাজের আনাচে-কানাচে এই বহুবর্ণিল মিডিয়া আয়োজন কী বার্তা নিয়ে হাজির হয়? এ কি গ্রামের মানুষদেরকে ভোক্তা সমাজের বাসিন্দা বানিয়ে তোলার কারসাজি, তারা কেবলই খদ্দের হয়ে উঠবে বহুজাতিক পণ্যবিক্রেতাদের? এ কি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ কিংবা নয়া-উপনিবেশবাদ? আমাদের আবহমান সংস্কৃতি তাহলে কি মনভোলানো বাজার-সংস্কৃতির চাপে ও তাপে উচ্ছন্নে যাচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টায় লিপ্ত হবো পরবর্তী আলোচনায়।

বাংলাদেশের সব গ্রামের চিত্র আজ কমবেশি এরকমই। শহর ও নগরের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র প্রবলভাবে বদলে গেছে এই সময়ের ব্যবধানে। অবশ্য, এই রূপান্ড়র আরও বড় পরিবর্তনের সাথে যুক্ত, যার সুবাদে আজ গ্রাম থেকে

শহর, দেশ থেকে বিদেশ, এবং সেই বিদেশের প্রত্যন্ড় কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা সবাই বৈচিত্রময় ও বহুমাত্রিক এক সুতোয় গাঁথা পড়ছে। মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯৬৪) গত শতকের সেই ষাটের দশকে টেলিভিশনের কারিশমা দেখে যে 'গে াবাল ভিলেজের' কথা বলেছিলেন, আজ তা এক অনিবার্য বাস্ড়ব, আমরা সেই বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা। ঘটে চলেছে বিশ্বায়ন, একে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, বা অর্থনীতির বিশ্বায়ন বললে ভুল হবে। উলে খ্য যে, সাংস্কৃতিক বা অন্য যেকোনো পণ্যের বিশ্ববাজার শত বছর আগেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজকের বিশ্বায়নের যে তীব্রতা ও গভীরতা তার সাথে তা কিছুতেই তুল্য নয়। এ-বিশ্বগ্রাম একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক ও বহুবর্ণিল; সমতাভিক্তিক নয়, বৈষম্যে ভরা। এ-গ্রামের মানুষদেরকে কেবলই ভোক্তা-ভোটার-অনুগত বানানোর পাঁয়তারা চলে; এ-গ্রামে সবার স্বর সমান জোরে শুনতে পাওয়া যায় না, কারো স্বর একেবারেই শোনা যায় না; সবার সমান ভূমিকাও থাকে না, সুবিধাও পায় না; প্রবলের স্বর প্রান্ড়িককে চাপা দেয়। অবশ্য এ-গ্রামে আধিপত্যের বিপরীতে প্রতিরোধের লড়াইও অবিরাম চলতে থাকে। জঙ্গি দমনের নামে দেশে দেশে মার্কিনি হামলা চলে, কর্পোরেট লুটপাট চলে, আবার ফেসবুক-টুইটারে ভর করে আরব বসন্ড়র হাওয়া বইতে থাকে এবং আন্দোলনের তোড়ে তিউনিসিয়া ও মিশরের স্বৈরশাসকদের পতন ঘটে যায়। নিশ্চিত করেই বলা যায় যে এই বিশ্বগ্রামের রীতিনীতি, আদাব-লেহাজ, আর রাজনৈতিক অর্থনীতি সবার জীবনকেই স্পর্শ করে যাচ্ছে। বস্তুত, আমরা একটা নতুন ধরনের সমাজকাঠামোর অবয়ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখছি, যা একইসাথে স্থানিক ও বৈশ্বিক, যা জাতি-বর্ণ-রাষ্ট্রের সীমানার পাঁচিল অনায়াসেই অতিক্রম করে ভিন্নতর সম্প্রদায় গড়ে তোলে। বলছিলাম, গত তিন দশক ধরে আমাদের সমাজ একটা কাঠামোগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে। এই পরিবর্তন বহুমাত্রিক, আর এই পরিবর্তনের বাহন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। আমরা যদিও একে জ্ঞান-সমাজ বা তথ্য-সমাজ বলেই কাজ চালিয়ে নিচ্ছি, ম্যানুয়েল কাসটেলস (২০০৫) বিকাশমান এই সমাজকে জ্ঞান-সমাজ বা তথ্য-সমাজ বলতে নারাজ। এর কারণ এই নয় যে জ্ঞান বা তথ্য বর্তমান সমাজের মূল চালিকাশক্তি নয়, বরং এ-কারণে যে সর্বকালে সব সমাজেই বস্তুত জ্ঞান ও তথ্য মূল চালিকাশক্তি ছিল; বর্তমান সমাজ-রূপান্ড়রের নতুন চালক হলো মাইক্রো-ইলেক্ট্রনিক নির্ভর নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি, যা পুরনো সমাজকাঠামোতে ফাটল ধরিয়ে নতুন সম্ভাবনার স্ফূরণ ঘটিয়েছে। তাই, তিনি একে বলছেন 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' বা আন্ড়র্জালিক সমাজ।

আন্তর্জালিক সমাজের মিডিয়া-সংস্কৃতি

এই আন্ড়র্জালিক সমাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি আশ্রয় করে যে সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটছে তাকে আমরা বলতে পারি মিডিয়া-সংস্কৃতি। সমাজে পূর্ববর্তী অ্যানালগ প্রযুক্তিনির্ভির

মিডিয়াগুলোর যে সাংস্কৃতিক ভূমিকা ছিল তার তুলনার বর্তমানের মিডিয়া-সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই, শব্দবন্ধটি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে। মিডিয়া বললেই এখনও আমাদের মাথায় ঘুরপাক খায় সংবাদপত্র, রেডিও, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের নাম। এগুলোকে আমরা 'গণমাধ্যম' বলি, যদিও এগুলোকে গণমানুষের মাধ্যম বলা চলে না কিছুতেই। বস্তুত, 'গণমাধ্যম' বলার ভিতরে এমন একটা সূক্ষ্ম ভাঁজ আছে যার ফলে আমাদের মনে বিভ্রম জাগে যে এগুলো হলো জনগণের মাধ্যম, এতে সমাজের সকল সদস্যের সমান অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণ থাকে। এই বিভ্রমের ফলে মিডিয়া একটা গণতান্ত্রিক চেহারা পায়, এবং এদের বিশেষ স্বার্থগত অবস্থান ও কর্মকা আড়াল হয়ে যায়। যদিও, বস্তুত শ্রেণীবিভাজিত সমাজের উঁচু তলার কিছু মানুষের বিশেষ রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মতাদর্শিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৃহত্তর জনগণের মাঝে বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এধরনের মিডিয়ার বেশিরভাগ কর্মকা পরিচালিত হয়। তাই এসব মিডিয়ার দর্পণে সবার চেহারা সমানভাবে ফুটে ওঠে না। কারো চেহারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়, কারো চেহারা বাঁকাচোরা দেখায়, আর বৃহদাংশ মানুষের চেহারা এক্কেবারেই দেখা যায় না। তথাপি, সেই অদৃশ্য জনমানুষের সামনে অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য 'রোল মডেল' হিসেবে সিনেমা, টিভি, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন নতুন তারকাশ্রেণি তৈরি হতে থাকে এই মিডিয়াগুলোতেই। তাই, এসব মিডিয়ার আগে উপসর্গস্বরূপ লেপ্টে থাকা 'গণ' অংশটুকু ছেঁটে ফেলাই বাঞ্ছনীয় এবং মালিকানার দিক দিয়ে বিচার করলে এগুলোকে কর্পোরেট মিডিয়া বলাই শ্রেয়। গত দুই দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনের সবগুলোরই জন্ম হয়েছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পেটের ভিতর থেকে, যাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য অধিকতর মুনাফা অর্জন করা, এবং মুনাফার পথ সুগম করতে একটা ভোগবাদী জনসমাজ নির্মাণ করা। এই মিডিয়াগুলোর আধেয়, মনোযোগ, বিজ্ঞাপনের বহর, আর উদ্দিষ্ট পাঠক-দর্শক-শ্রোতার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা সম্ভব।

যাহোক, আজকের মিডিয়া-সংস্কৃতিতে গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত মিডিয়াগুলোর ব্যাপক অংশীদারিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে। তবে, সেটুকুই সব না। গণমাধ্যম হিসেবে কথিত সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন এই বিকাশমান মিডিয়া-সংস্কৃতির নিয়ামক কারণ নয়, বরং বলা যায় বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের ওপর উচ্চকোটীর কিছু মানুষের ক্ষমতা ও স্বার্থ টিকিয়ে রাখবার এই মাধ্যমগুলো নিজেরাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে নতুন ডিজিটাল মিডিয়া-সংস্কৃতির কারণে - উৎপাদন, বিতরণ, ভোগ সকল ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন দৃশ্যমান। এই মিডিয়াগুলো এখন সমাজে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে, অনেক রকমের প াটফর্মে বিচরণ করছে এবং ভৌগোলিক সীমা ও দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে অনেক বেশি মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। তদুপরি, আধিপত্যশীল এই মূলধারা মিডিয়াগুলোর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক নির্মাণে ও

তথ্য আদানপ্রদানে আরও অনেক প্রকৃতির, যেমন ইন্টারনেট-নির্ভর বিভিন্ন সাইট ও প াটফর্ম এবং সেলফোন মিডিয়ার অংশগ্রহণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং সব ধরনের মিডিয়া একই পাটাতনে এসে গলাগলি ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, যা (গণ)মাধ্যমের সনাতন সংজ্ঞায় ধরা যায় না। যেমন মুঠোফোনেই সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও ভিডিও স্ট্রিম, এফএম রেডিও, গানের রেকর্ড, ক্যামেরা সব পেয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যানালগ প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক পণ্য ছিল সুনির্দিষ্টতা (ফিক্সিটি) কেন্দ্রিক, কপি করা গেলেও বদলানো যেত না, অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর সাংস্কৃতিক পণ্য - টেক্সট, ইমেজ, সাউন্ড - সঞ্চরণশীল, পরিবর্তনশীল, ফ্লুয়িড। চাইলেই বদল ঘটানো ও সংরক্ষণ, বিতরণ ইত্যাদি করা যায়। আর এসব সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মাণে মুষ্টিমেয়র আধিপত্যেরও অবসান ঘটেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবাইকেই সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদকে পরিণত করেছে, নিজেদের উপস্থিতি জাহির করবার সুযোগ করে দিয়েছে। অংশীদারিত্ব, বহুস্বর আর মিথস্ক্রিয়া এই মিডিয়া-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই, এখানে সংস্কৃতি বলতে কেবল কোনো নাটক, গান, কবিতা, চলচ্চিত্র, উপন্যাস বা অন্য কোনো অভিপ্রকাশ নয়, এবং মিডিয়া বলতেও কেবল গণমাধ্যম হিসেবে কথিত মিডিয়াগুলোকে বোঝানো হচ্ছে না। বরং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন, অবসর, বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প, সামাজিকতা, চৈতন্য এবং আত্মপরিচয় নির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর নানাবিধ মিডিয়ার কেন্দ্রীয় ভূমিকার কারণে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তাকেই বোঝানো হচ্ছে। আমাদের সকল অস্তিত্ব জুড়ে আজ এই মিডিয়া-সংস্কৃতি। আজকের যুগে তাই সমাজে মিডিয়া পণ্যের উৎপাদন, প্রভাব, বা ব্যবহার ও তার তৎপর্য, বিচার করতে হলে এই বহুমাত্রিকতা ও প্রযুক্তির মধ্যস্তৃতার স্বীকৃতি দিতে হবে।

'মনোজগতে উপনিবেশ'?

মিডিয়া-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজকের গ্রামসমাজের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে তা আমাদের চোখে সচরাচর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভোগবাদী সমাজ নির্মাণের প্রকল্প হিসেবেই গণ্য হয়। এরূপ ভাবনার চিহ্ন আমরা পেছনের ইতিহাসে খুঁজতে পারি। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যখন অধিকতর হারে অ্যানালগ মিডিয়া-সাংস্কৃতিক পণ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন ধুয়ো উঠলো যে বিশ্ব-সংস্কৃতি সমরূপতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে, সমাজে একই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবতার একইরকম ভাষ্যই কেবল টিকে থাকবে! এই বক্তব্য দেবার সময় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুতর দিক উপেক্ষা করে যান: ভাষার বৈচিত্র্য এখনও টিকেই আছে, এমনকি নতুন বৈশ্বিক ভাষা (ইংরেজি) নির্মিত হচ্ছে; বিদেশি সংস্কৃতি স্থানীক সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে বৈচিত্রপূর্ণ হাইব্রিড সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে; এবং নতুন ধরনের স্থানিক

সংস্কৃতিরও জন্ম হচ্ছে। তাই, সমরূপতা নয় বরং বৈচিত্র্যই এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। মার্ক পস্টার "ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ" ধারণা ব্যবহার করেছেন এই বৈচিত্র্য তুলে ধরতে।

সংস্কৃতির রূপান্ড়রকে আমরা বরং এভাবে দেখতে পারি, অ্যানালগ প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কৃতি আধুনিক সমাজের বিকাশে সহায়তা করেছে। প্রথমে প্রকাশনা, তারপরে রেডিও ও চলচ্চিত্র, এবং তারও পরে টেলিভিশন ও টেলিফোন সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশগুলোকে সর্বস্ড়রে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছে। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের তাত্ত্বিক ম্যাক্স হর্কহেইমার এবং থিওডর অ্যাডোর্নোর (১৯৭২) দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়া সমাজকে গণসমাজে (ম্যাস সোসাইটি) রূপান্ড়র করে, যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের দ্বান্দিকতা ও শোষিতের সমালোচনাত্মক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে, যেমন ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের (১৯৩৬) মতে অ্যানালগ প্রযুক্তি বিশেষত চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষকে বরং সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করেছে এবং নতুন ধরনের বৈপ বিক রাজনীতির দ্বার খুলে দিয়েছে। একইসাথে, মাইকেল ওয়ার্নার গণতন্ত্রের চর্চার জন্য সাংস্কৃতিক জমিন তৈরিতে সংবাদপত্রের গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। অনেকের মতে, অ্যানালগ সাংস্কৃতিক প্রযুক্তির সবচেয়ে মূর্খতম মাধ্যম টেলিভিশন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোকে জাতির ধারণায় একতাবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। এই ধারায় সবচেয়ে উলে খযোগ কাজ হলো, বেনেডিক্ট অ্যান্ডার্সনের 'ইমাজিনড কমিউনিটিস' (১৯৮৩), যেখানে তিনি দেখিয়েছেন মুদ্রণশিল্প কীভাবে পৃথিবীজুড়ে দেশে দেশে জাতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। আজ আমরা বাংলাদেশ সীমানায় যে রাষ্ট্রকাঠামো অর্জন করেছি ও জাতি ধারণায় সংঘবদ্ধ হয়েছি তার কল্পনা সুসংহত ও সর্বজনীনতা পেয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমেই। আর, বর্তমানে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত অনেকগুলো দৈনিক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন, প্রায় দুই ডজন টেলিভিশন চ্যানেল, এবং অনলাইনের ব গ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য প াটফর্ম, আর মোবাইল ফোন জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে একটা সংহত রূপের দিকে ধাবিত করছে এবং একইসাথে আন্ড়র্জাতিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত করছে। এর প্রমাণ হলো যে, স্পর্শকাতর কোনো ঘটনা ঘটলে মুহূর্তের মধ্যেই তার অনুরণন দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়ার জন্ম হচ্ছে।

তাই বর্তমান সময়ে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের রমরমা দিনে, গ্রামে-গঞ্জে এর অপ্রতিরোধ্য বিস্ড়ার দেখে আমাদের আবহমান সংস্কৃতি রসাতলে গেল বলে রব উঠাবার আগে ভিন্ন সম্ভাবনার দিকগুলোও একটু ভেবে নেয়া দরকার। ভোক্তা দর্শক-শ্রোতাদের অক্রিয় গ্রাহক ভাবার দিন চলে গেছে। তারা সক্রিয়ভাবেই অনুষ্ঠান বাছাই করে, নিজেদের মূল্যচেতনার সাথে মিলিয়ে নেয় এবং নতুন নির্মাণে সামিল হয়। লিসা পার্ক (২০০৫) লেখেন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন কেবলই পশ্চিমা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের

এজেন্ট এবং নব্য ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র হিসেবে কাজ করে - অ্যাবোরিজিনদের মিডিয়া ব্যবহার এই বদ্ধমূল ধারণা চ্যালেঞ্জ করে। রমেশ শ্রীনিবাসও দেখিয়েছেন, অ্যাবোরিজিনদের মতোই ইনুইটরা স্যাটেলাইট প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে বৈশ্বিক জ্ঞানবিদ্যা ব্যবহার করে নিজেদের সংস্কৃতি বেগবান করা এবং নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার জন্য। বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে মিডিয়া ব্যবহারের বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া। স্থানিক পরিসরে বাস করেও আমরা বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠেছি। মানুষের পোশাক, পেশা, চিন্তা, অভ্যাস ও জীবিকা সব অদল-বদল ঘটে যাচ্ছে। পিয়ার-টু-পিয়ার মিডিয়া-প্রযুক্তি (ফাইল শেয়ারিং, ইউটিউব, মাই স্পেস, উইকিপিডিয়া, বিপুল অনলাইন গেম ইত্যাদি) আংশিকভাবে ব্যক্তির শরীরকে তার স্থানিক পরিসর থেকে বিযুক্ত করে, স্থানিক বন্ধন খানিকটা আলগা করে বৈশ্বিক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে। আর, এই ঘনিষ্ঠতায় যুক্ত করে দিচ্ছে তথ্য-মেশিন। বর্তমান সংস্কৃতি মূল্যায়নে মানব উপাদানের সাথে যন্ত্র-উপাদান তাই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ইয়াং অং অবশ্য সতর্ক করে দেন যে, এক জাতিগোষ্ঠী থেকে অন্য জাতিগোষ্ঠীতে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অভ্যন্ড়রে মিডিয়া-সংস্কৃতির এই বিস্ড়তিকে ইমেজ ও সাউন্ডের অবাধ সম্প্রসারণ হিসেবে না দেখে বরং সংস্কৃতির ওপর কর্পোরেটীয় নিয়ন্ত্রণ হিসেবে দেখাই ভালো। আমরা বরং এখন এই ভাবনাটাকে বিচার করে দেখতে পারি।

একচেটিয়া কর্পোরেট দখলদারিত্ব বনাম বৈচিত্র্যময় বহু স্বর

একথা সত্য যে নতুন প্রযুক্তির প্রচলন করা হয়েছে মূলত কর্পোরেট-চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে, যদিও তা ভিন্নতর সম্ভাবনার দিকও উন্মোচন করেছে। এগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিডিয়া-প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্মীসংখ্যা হ্রাস করেও অধিকতর কাজ আদায়ের সুযোগ করে দিয়েছে, এবং তাদের জন্য বৈশ্বিক বিতরণ-ব্যবস্থা গড়ে-তোলাও সম্ভব করেছে। আন্ড়ঃসক্রিয়তা (ইন্টারঅ্যাক্টিভ) সম্ভবকারী প্রযুক্তি প্রচলনের ফলে সৃষ্ট অডিয়েন্স 'মিথস্ক্রিয়ার' (ইন্টারঅ্যাকশন) সুযোগ প্রধানত কেনাকাটা করতেই সহায়তা করে, কিন্তু একই সাথে তা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজ অডিয়েন্স সম্পর্কে বিস্ড়ারিত জানার, এবং তার ভিত্তিতে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সাথে চমৎকারভাবে মিলিয়ে অনুষ্ঠানমালা ও বিজ্ঞাপন পরিবেশনের সুযোগ করে দেয়, সেইসাথে এসব অনুষ্ঠানের মাঝে মাউসের একটামাত্র ক্লিক করে পণ্য বিক্রিও সম্ভব করে তোলে। আর এসব কর্পোরেট মিডিয়ার লালিত সংস্কৃতি ও মতাদর্শ বহুলাংশেই জীবন 'উদযাপন' ভাবধারা, এবং ভোগ্যপণ্য ও পণ্যার্জনের ধারণাকেন্দ্রিক; এবং এগুলো জনজীবনের জন্য আবশ্যক যেকোনোরূপ কৌমবোধ (সেন্স অব কমিউনিটি) দুর্বল করে দেয়। এই মিডিয়া-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যই (হলমার্ক) হলো অবিশ্রান্ড়, সর্বব্যাপী বাণিজ্যিকতা। মিডিয়ায় কর্পোরেট আধিপত্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তার গি সীমিত করে ফেলছে তো বটেই, বাণিজ্যিকতা আরও বিস্ড়

ারিত হয়েছে। তবে, একথাও সত্য যে সাংস্কৃতিক ইন্ডাস্ট্রি তার পণ্য-সীমানার গ িতে নতুন মিডিয়াকে ধরে রাখতে ইতোমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন ইউটিউবে প্রতিদিন ৬৫ হাজারের বেশি ফাইল আপলোড করা হয়। কেবল বিপুল পুঁজিপতি অভিজাতরাই সাংস্কৃতিক পণ্য উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিকল্প মিডিয়া পরিসর সেটা করতে দেয় না।

এই রূপান্ড়রের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য বোঝা নিঃসন্দেহে খুবই জর ি। প্রযুক্তি-নির্ভর প্রকাশের ক্ষেত্রে আসা পরিবর্তনগুলোর নতুনত্বের ওপর গুর ত্বারোপের সাথে সাথেই জর ি হলো, রাজনৈতিক চৈতন্যের ক্ষেত্রে আসা পরিবর্তনগুলোও নিবিড়ভাবে পাঠ করা। আজকাল সমাজ কত সফলভাবে প্রযুক্তির বিন্যাস ঘটাতে পারছে তার ওপরে সম্পদ, ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি অনেকখানিই নির্ভরশীল। এখনও জারি-থাকা কেন্দ্রীয় সত্য হলো: গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য আবশ্যক হলো তথ্যসূত্রগুলোর গণতন্ত্রায়ন এবং একটা অধিকতর গণতান্ত্রিক মিডিয়াব্যবস্থা। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে হলে অমুনাফামুখী গোষ্ঠীভিত্তিক সম্প্রচারকেন্দ্র ও নেটওয়ার্ক এবং জন-অভিগম্য চ্যানেলগুলো আরও লাগসইভাবে ব্যবহার করতে শেখা, ইন্টারনেট এবং স্বাধীন মিডিয়া গড়ে তোলা আবশ্যক হবে। কর্পোরেট আধিপত্যের বিপরীতে পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের অবিরাম প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বায়নের দুনিয়ায় শোষিতের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের চেতনায়, আমাদের সময়ের গায়ে লেপ্টে থাকা পণ্যায়িত-বাণিজ্যায়িত মিডিয়ার মদির-সম্মোহন থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াকে দেখতে শেখা, 'বিটুইন দ্য লাইন' পড়তে শেখা এবং বিকল্প মিডিয়া-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো অত্যন্ড় জর ি বলেও আমি মনে করি - যদিও এই কাজগুলো মোটেই সোজা নয়। কারণ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-অফিস-আদালত মায় আপন পরিবারের আঙিনাতেও পায়ে পায়ে ছড়ানো রয়েছে দীক্ষায়ণের নিপুণ জাল।

তথ্যসূত্র

অ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট (১৯৮৩)। ইমাজিন্ড কমিউনিটি: রিফ্লেকশনস অন দি অরিজিন অ্যান্ড স্প্রেড অব ন্যাশনালিজম। লন্ডন: ভার্সো।

হক, মফিদুল (১৯৮৭)। মনোজগতে উপনিবেশ: তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত। ঢাকা: প্রাচ্য প্রকাশনী।

ক্যাস্টেলস, ম্যানুয়েল (২০০৫)। নেটওয়ার্ক সোসাইটি: ফ্রম নলেজ টু পলিসি, *নেটওয়ার্ক সোসাইটি: ফ্রম নলেজ টু পলিসি*। ম্যানুয়েল, ক্যাস্টেলস ও কার্ডোসো, গুস্ড়াভো সম্পা.। ম্যাসাচুসেটস: দ্য জন্স হপকিনস ইউনিভার্সিটি।

পার্ক, লিসা (২০০৫)। কালচারস ইন অরবিট: স্যাটলাইটস অ্যান্ড দ্য টেলিভিস্যুয়াল। ডারহাম: ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বেঞ্জামিন, ওয়াল্টার (২০০৮, মূল ১৯৩৬)। 'দ্য ওয়ার্ক অব আর্ট ইন দি এজ অব মেকানিকাল রিপ্রডাকশন'। এন ব্যামিংটন ও জে থমাস সম্পাদিত, দ্য রাউটলেজ ক্রিটিকাল অ্যান্ড কালচারাল থিওরি রিডার। অক্সন: রাউটলেজ।

হর্কহেইমার, ম্যাক্স ও অ্যাডোর্নো, থিওডর (২০০৭, মূল ১৯৭২)। ডায়লেকটিক অব এনলাইটেইনমেন্ট। পালো অ্যাল্টো: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

আ-আল মামুন: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: almamun.ru@gmail.com.

ভিন্নমতহীন মিডিয়ার যুগে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের ব্যক্তিগত ইতিহাস

সেলিম রেজা নিউটন

ভিন্নমতহীন মিডিয়ার এই যুগে আপনি এখানে 'আনঅফিসিয়ালি সেন্সরড' এক লেখকের একটি নিবন্ধ পড়া শুর" করতে যাচ্ছেন। এমন এক লেখক, যাঁর ছাত্রজীবনের কোনো রচনা কোনো জাতীয় দৈনিক বা সাপ্তাহিক কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি, অথচ যাঁকে প্রধান একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ১৮ বছরের শিক্ষকতা শেষ করে মাঝ বয়েসে এসে আজ নিজের রচনা ছাপানোর জন্য একটি 'নিরাপদ মিডিয়া' খুঁজতে হচ্ছে। 'নিরাপদ মিডিয়া' হচ্ছে এমন একটি মিডিয়া যেখানে নিজের কোনো লেখা পাঠানোর পরে তাঁকে আর এই বলে হা-পিত্যেস করতে হবে না: ছাপবে তো! হ্যাঁ, রাজশাহীর দৈনিক *সোনার দেশ* ছাপবে তাঁর লেখা – মানবীয় বিস্ময়ে ভরপুর এক ঘটনা বৈকি।

স্বনামধন্য মার্কিন প্রফেসর ও ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী নোম চমস্কি তাঁর সহলেখক আরেক মার্কিন প্রফেসর এডওয়ার্ড এস. হারম্যানের সাথে মিলে *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ দ্য ম্যাস মিডিয়া* (লন্ডন: দ্য বডলি হেড, ২০০৮) নামে যে বইটি লিখেছেন, তাতে তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন 'আনঅফিসিয়াল সেন্সরশিপ' তথা 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' বা 'স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ' কাকে বলে। 'স্বাধীন' মিডিয়া হিসেবে সারা দুনিয়ায় খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড়লোক-মালিকদের কর্পোরেট মিডিয়ার সত্যিকারের স্বাধীনতার দৌড় কোন গীর্জা পর্যন্ড়, সেটি তাঁরা দেখিয়েছেন ঐ মিডিয়ার কাভারেজের বিস্ড়ারিত তথ্য-উপাত্তসহকারে। তাতে দেখা গেল, ঐ সব মিডিয়ার মতপ্রকাশের আঙিনাটি আসলে খুব সংকীর্ণ একটি গ ির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐ সীমার মধ্যে আঁটে যে সব মতামত, কেবল সেগুলোই তাঁরা প্রকাশ করেন। সীমার বাইরে গেলেই কোনো মত আর প্রকাশিত হয় না – সেন্সরড হয়।

সেন্সরশিপের এই সীমাটি কিন্তু মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিরোধী কোনো রাষ্ট্রীয় আইনকানুন এসে নির্ধারণ করে দেয় না। আইনকানুন এবং রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপের দিক থেকে মার্কিন মিডিয়া সত্যিই স্বাধীন। কিন্তু স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের এই সীমা নির্ধারণ

করে মিডিয়া নিজেই। এ কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর মিডিয়ার নিজের দিক থেকেও কোনো সেন্সর-আইন জারি করা লাগে না। আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিডিয়ার যে গড়ন-কাঠামো, সেই কাঠামোর খুঁটিগুলোই নির্ধারণ করে দেয়, কী ছাপা যাবে আর কী ছাপা যাবে না। খুঁটিগুলোর দিকে তাকালে আপনিও বুঝবেন, এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আপনি কতটা কী প্রত্যাশা করতে পারেন, না পারেন।

প্রতিষ্ঠানটির দিকে তাকান। প্রথমেই দেখতে পাবেন কর্পোরেট মিডিয়া একটি বৃহৎ আকারের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ভয়ঙ্কর মাত্রায় কেন্দ্রীভূত। এর মালিকগোষ্ঠী সমাজের এক শতাংশ মানুষের অন্তর্ভুক্ত বড়লোকদের শ্রেণীভুক্ত। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রধানতম তাড়না হচ্ছে মুনাফার তাড়না। যত ভাবে পারা যায় খরচ কমানো এবং আয় বাড়ানোই এর মূল লক্ষ্য। এই হলো কর্পোরেট মিডিয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য। তাহলে, ব্যবসা নামক জিনিসটার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কিছু কি এখানে ছাপানো সম্ভব? মুনাফা-তাড়নার জন্য অশ্বস্তিকর এমন কোনো মত কি এতে প্রকাশ করা সম্ভব? ব্যক্তিগত মালিকানার কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে কি এখানে কথা বলা সম্ভব? বড়লোক-গরিবের শ্রেণীবিন্যাসগত বৈষম্য ও অসমতার জন্য বেমানান হয় এমন কোনো কথা কি আদৌ এখানে তোলা সম্ভব?

তার পর দেখুন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেট মিডিয়ার আয়ের প্রাথমিকতম উৎস হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এটি এর পাঠকগোষ্ঠীকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে দেয় টাকার বিনিময়ে। যার পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বেশি তার বিজ্ঞাপন বেশি, টাকা বেশি। তাই যে ভাবেই হোক, যে উপায়েই হোক, পাঠক-দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তা-ই যদি হয়, তাহলে পাইকারি হারে পাঠক বাড়ানোর জন্য সস্তা, কিমাকার রুচি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প এর কাছে আছে কি? এর পাশাপাশি, বিজ্ঞাপনী বেচাকেনাকে আড়াল করার স্বার্থে নানা রকমের 'সমাজসেবা'মূলক কাজের ভান করা ছাড়া অন্য কোনো পথ এর জন্য খোলা থাকে কি? আর, বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণকারী মতামতের বা ব্যক্তির 'গলা' কেটে ফেলা ছাড়া এই মিডিয়ার তাহলে উপায় কী? খোদ বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কোনো কথা প্রকাশের উপায় তার আছে কি? এক কথায় বলতে গেলে, জর্জ অরওয়েল যেমনটা লিখেছিলেন, ব্যক্তির ও সমাজের প্রতিরোধের আওয়াজ ছাড়া আর যা কিছুই কর্পোরেট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় তার সবই কোনো না কোনো রকমের বিজ্ঞাপন ও পাবলিক রিলেশন্স মাত্র। সুতরাং, বিজ্ঞাপন ও পাবলিক রিলেশন্সের বাইরে যা কিছু আছে তার সবই প্রকাশের অযোগ্য হয়ে পড়ে। নিজে নিজেই নিজের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা ছাড়া তখন আর পথ কোথায় এই মিডিয়ায়?

তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটিকে চমস্কি-হারম্যান শনাক্ত করেছেন তা হলো "বিশেষজ্ঞদের" দেয়া তথ্যের ওপর মিডিয়ার নিরুপায় নির্ভরশীলতা। এইসব "বিশেষজ্ঞ"রা আসলে সরকার, ব্যবসায়ী-মহল এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিশেষ পছন্দের বুদ্ধিবৃত্তিক এজেন্ট মাত্র। এঁরা সব কেউ লাল রঙের কেউ বা নীল, কিন্তু আদতে একই পদার্থ। সুতরাং, মিডিয়ার যতগুলো মুখ আছে সবগুলো মুখেই মূলত একই চেহারা, একই কণ্ঠস্বর। এ ছাড়া, আপনাকে যদি সত্যি সত্যি সারা দেশ থেকে সমস্ত দরকারি খবর জোগাড় করতে হয় এবং সেগুলোর সত্যিকারের বিশে ষণ পেশ করতে হয়, তাহলে তো আপনার হাজার হাজার সংবাদদাতা এবং শত শত বিশে ষক দরকার পড়বে। তা করতে গেলে আপনার খরচের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আপনার মুনাফা যাবে কমে। সুতরাং, সমাজ-সংসারে যা-ই ঘটুক না কেন, ধূর্ত সেই শেয়াল কর্তৃক বোকা কুমিরকে একই ছানা বারবার দেখানোর মতো করে হাতেগোনা কয়েক জন বা কয়েক ডজন "বিশেষজ্ঞ"কে ক্রমাগতভাবে হাজির করতে থাকে কর্পোরেট মিডিয়া। এ ছাড়া তার উপায় কী? এ জন্য তাকে বানাতে হয় সর্বগ্রহণযোগ্য মহাপ্রতিভাধর কতিপয় বুদ্ধিজীবীর ভাবমূর্তি। বানাতে হয় এই ধারণা যে কতিপয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া আমরা আমাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম নই। নিজেদের জীবন আমরা নিজেরা চালাতে সক্ষম নই। কাজেই, শাসক প্রশাসক মন্ত্রী মিনিস্টার পার্লামেন্ট পুলিশ র‍্যাব রাক্ষস আইন আদালত কারাগার মিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কতকগুলো কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের জীবন সমর্পণ করে দিতে হবে আমাদেরকে – ইনিয়ে-বিনিয়ে এ কথা বলা ছাড়া মিডিয়ার আর উপায় কী? আর, এই সব ধারণাকে সত্যি সত্যি চ্যালেঞ্জ করার মতো কথাবার্তাকে 'অবাস্তব' 'আজগুবি' 'আবর্জনা' বলে আখ্যায়িত করে নিউজরুমের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া ছাড়া কর্পোরেট মিডিয়ার আর পথ কই?

প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেট মিডিয়ার চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে "ফ্ল্যাক" অথবা "চিন্তা-চাবুক"। সাংবাদিকতা বিভাগ, সাংবাদিকদের নানান প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকতার জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন পুরস্কার, সাংবাদিকতা-বিশেষজ্ঞদের নানান লেখাপত্র এবং তাঁদেরকে নিয়েই বানানো টকশো ইত্যাদি প্রভৃতির মাধ্যমে মিডিয়াকে "নিয়মানুবর্তিতা" শিক্ষা দেয়ার হাতিয়ার হচ্ছে এই "ফ্ল্যাক"। মিডিয়া যদি প্রথম কয়েক দিনে বিডিআর-বিদ্রোহের সপক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকে, তো পরের কয়েক দিনের মধ্যেই সেই 'বিভ্রান্তি' তারা দূর করে ফেলে এই চিন্তা-চাবুকের চাবকানিতেই বটে। সুতরাং, 'বিভ্রান্তিকর' যাবতীয় কিছুই মিডিয়াতে প্রকাশের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

কর্পোরেট মিডিয়ার পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, কর্পোরেট মতাদর্শ – কখনো "কমিউনিজম-বিরোধিতা", কখনও "সন্ত্রাসবাদ-বিরোধিতা", কখনও "ইসলাম-বিরোধিতা"র মতাদর্শ। আবার কখনও বা "মুক্তবাজার অর্থনীতি" তথা "নয়াউদারনীতিবাদ" এর প্রতি ঢালাও, অন্ধ সমর্থনের কর্পোরেট মতাদর্শ। এই সব

মতাদর্শই হচ্ছে মুনাফার ধর্ম, সেন্সরশিপের ধর্ম – মিডিয়ার ধর্ম। সুতরাং, এই সব মতাদর্শের তথা রাষ্ট্র-কর্পোরেট সেকুলার ধর্মের বাইরেকার 'বিধর্মী' কোনো মতামত বা খবরাখবর মিডিয়ার কাছে স্রেফ 'নাস্তিকতা'র পর্যায়েই পড়ে, যার জন্য সেন্সরশিপ বরাদ্দ করা ছাড়া তার আর উপায় কি?

মালিকানা-মুনাফা-ব্যবসা; আয়ের উৎস হিসেবে বিজ্ঞাপন; বিশেষজ্ঞ-নির্ভরতা; চিন্তা-চাবুক; এবং কর্পোরেট মতাদর্শ – কর্পোরেট মিডিয়ার এই পাঁচ খুঁটি বা পাঁচ বৈশিষ্ট্যকে চমস্কি-হারম্যান আখ্যায়িত করেছেন পাঁচ 'ছাঁকনি' বা 'ফিল্টার' হিসেবে। এই ছাঁকনিগুলো একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং একে অন্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। সংবাদের বা মতামতের কাঁচামালকে অবশ্যই এই ধারাবাহিক ফিল্টারসমূহের ভেতর দিয়ে পাশ করে যেতে হয়। পরিশেষে পড়ে থাকে কেবল সেই 'পরিচ্ছন্ন' তলানিটুকু, যা ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই ফিল্টারগুলো সমাজে বিদ্যমান আলাপ-আলোচনা-তৎপরতা বা ডিসকোর্সের মৌলিক ভিত্তিকাঠামো। এই ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে যাবতীয় সংবাদ ও মতপ্রকাশের সংজ্ঞা। সুতরাং, এই পুরো প্রক্রিয়াটা 'সাংবাদিকতা' নামক যে জিনিসটিকে উৎপন্ন করে, তা আসলে কর্পোরেট বড়লোক শ্রেণীর আর্থরাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও সমাজবিন্যাসের সপক্ষে পরিচালিত প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা ছাড়া কিছুই না। অন্য যে কোনো প্রচারণা বা প্রোপাগান্ডার মতোই এ বস্তু অত্যন্ত সিস্টেমেটিক, অনুমানযোগ্য, একেপেশে এবং পৌনঃপুনিক। কর্পোরেট মার্কিনী সাংবাদিকতার এই মডেলটিকে চমস্কি-হারম্যান তাই আখ্যায়িত করেছেন 'প্রচারণা মডেল' নামে।

প্রচারণা মডেলের এই ফিল্টারগুলোর ক্রিয়াকলাপের পরিণামেই সমাজে গড়ে ওঠে মিডিয়ার এলিট-একাধিপত্য এবং ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে কোণঠাসা করে ফেলার যন্ত্র রমন্ত্র-কলাকৌশল। গোটা এই প্রক্রিয়াটি চলে তথাকথিত মুক্তবাজারের নিয়ম মেনেই; এবং তা এতই 'স্বাভাবিক' একটা প্রক্রিয়া যে এর মধ্যকার সাংবাদিকেরা সাধারণত টেরই পান না যে তাঁরা কোনো সেন্সরড প্রচারণা-সিস্টেমের ভেতরে কাজ করছেন। তাঁরা ভাবেন তাঁরা কতকগুলি পেশাগত সংবাদ-মূল্যের ভিত্তিতে "বস্তুনিষ্ঠভাবে" সংবাদ-মতামত বাছাই ও ব্যাখ্যা করছেন। এই ফিল্টারগুলোর বাধা সাপেক্ষে তাঁরা প্রায়ই বস্তুনিষ্ঠ থাকেন বৈকি। আর, এই ছাঁকনিগুলো এত শক্তিশালী এবং এমন মৌলিকভাবে সিস্টেমের ভেতর থেকে গড়ে-ওঠা যে সংবাদ-মতামতের বিকল্প কোনো ভিত্তির কথা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

পরে হয়ত কখনও চমস্কি-হারম্যানের 'প্রচারণা মডেল' নিয়ে খুলে বলা যাবে। আপাতত এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এখন বাংলাদেশেও মার্কিনী আদলের কর্পোরেট মিডিয়ার যুগ চলছে। আর আমাদের এখানকার এই কর্পোরেট মিডিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিওলিবারাল মিডিয়া তথা মুক্তবাজার মিডিয়ার মতোই 'স্বাধীন' ও শক্তিশালী

হয়ে উঠেছে। ফলে, আমার মতো তুচ্ছ এক জন লেখককেও স্রেফ নিজেকে বোঝার তাগিদে, অর্থাৎ নিজের কচিবেলার রচনার প্রকাশযোগ্যতা আর পক্বকালের রচনার অপ্রকাশযোগ্যতার পরস্পর-বিরোধিতাকে বোঝার তাগিদে, আলোচনা করতে হয় স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের তাৎপর্য।

মনে পড়ে, এক-এগারোর জরুরি আইনকে স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে, সজ্ঞানে চ্যালেঞ্জ করার পরিণামে জেল খেটে বেরিয়ে আসার সময়টাতে 'মিডিয়ার খাদ্য' হিসেবে যখন আমার/আমাদের বাজার-দর চড়া, তখন *প্রথম আলো* পত্রিকাটি বার বার করে চাওয়ার পর আমি তাঁদেরকে আটটা কলাম এক ধাক্কায় পাঠাই। দিন পনেরো সময় নিয়ে ধাক্কাটা দিব্যি সামলে নেবার পর অনেক মিনমিন করে ইনিয়েবিনিয়ে তাঁরা জানান একটা কলামও তাঁরা ছাপতে পারছেন না। বাপ রে! কী ভয়াবহ লেখক আমি! আর, কী ভয়াবহ একটি পত্রিকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বনির্ধারিত সীমা! (উলে খ্য, ঐ আটটা কলামই পরে লন্ডনপ্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন জার্নাল 'ইউকে বেঙ্গলি'তে ছাপা হয় (http://www.ukbengali.com/Columns/Col-2008/Col-2008-Headings.htm)।

মনে পড়ে, তখনই 'সমকাল' পত্রিকায় আমার ঐ আট কলামের অন্যতম রচনা "আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ" ছাপতে হয়েছিল সেনাবাহিনী সংক্রান্ত অংশগুলো বাদ দিয়ে। নোম চমস্কির ছাত্র হিসেবে যেহেতু জানা ছিল, তাই আগে তো দিতামই না, এই দুই পত্রিকার অভিজ্ঞতার পর দৈনিকে আমি আর লেখা দিই নি। কেউ চাইলেও না। (এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল *আমার দেশ*। আর কেউ তো ছাপে না, ছাপবে না; তাই ওঁদেরকেই দিয়েছিলাম "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের বিপজ্জনক পথ" নামে আমার একটি 'বিপজ্জনক' লেখা। আনন্দের কথা: ছাপা হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ২০১১-তে। ছাপা হয়েছিল – কারণ, স্বাধীনতা ও ভিন্নমতের মূল্য তাঁদের চেয়ে বেশি এখন আর কেউ জানেন না। কিন্তু, পরে যখন তাঁরাই আবার ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হবেন তখন কতটা সেই জ্ঞান পত্রিকার কাজে লাগাবেন তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বৈকি।)

মনে পড়ে, আমার *বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা: যেহেতু বর্ষা, ২০১০) বইটির কথা। বিডিআর-বিদ্রোহ চলা কালে, বিদ্রোহের দ্বিতীয় দিন বিকেলে (টিভিতে তখনও 'লাইভ' পরিবেশিত হচ্ছে বিদ্রোহ), 'বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি' (এমসিজে ৩০৬ নং) কোর্সের পূর্বনির্ধারিত একটি ক্লাসে বিদ্রোহের 'লাইভ' পর্যালোচনা হাজির করি আমি। রেকর্ড-করা সেই ক্লাসের হুবহু অডিও-অনুলিপি, পরে সংযোজিত টীকাভাষ্য সহকারে, প্রকাশিত পরের বই মেলায়। এবং ঘটনাচক্রে, সেটি মেলায় গেল এবং আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রবীণ শ্রমিকনেতা জসিম ম ল কর্তৃক তার 'মোড়ক উন্মোচন' হলো বিডিআর-বিদ্রোহের ঠিক প্রথম বর্ষপূর্তির দিনে, ২৫শে

ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে। পরের দিনের পত্রিকার মেলা-রিপোর্টিং-এ তা উলে খও করল *প্রথম আলো*।

সাহিত্যপাতায় পুস্ড়ক-পরিচিতি বা পুস্ড়ক-পর্যালোচনা বা এরকম কিছু একটা করার জন্য 'যা কিছু ভালো তার সাথে *প্রথম আলো*'তে এই বইয়ের একাধিক কপি প্রকাশক পাঠিয়েছিলেন আমার তরফে। সেই বই যে যথাস্থানে পৌঁছেছে সে কথা সাহিত্যপাতার সম্পাদক, কবি, বন্ধুভাজনেষু জাফর আহমেদ রাশেদ আমার কাছে কবুলও করেছেন। তবু দীর্ঘ দিন কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। পরে শ্রদ্ধাভাজনেষু সাজ্জাদ শরীফের সাথে কয়েকবার মুখে-মোবাইলে-এসএমএস-এ কথা হয়। সাজ্জাদ ভাই প্রতিবারই বললেন বইটার রিভিউ হওয়ার কথা আছে। জানা গেল যে দায়িত্বটা স্নেহভাজন তৈমূর রেজাকে দেওয়া হয়েছে। তৈমূরের সাথেও একাধিকবার নানা আঙ্গিকে কথা হয়েছে। উনিও বলেছেন উনি করবেন কাজটা। পরে গোটা গোটা বছর গেল 'প্রথম আলো'তে কোনো রিভিউ ইত্যাদি ছাপা হলো না। অন্য কোনো দৈনিকেও এ নিয়ে কোনো কিছু ছাপা হয়েছে বলে শুনি নি, দেখি নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বাধন অধিকারীর করা একটি রিভিউ। প্রকাশিত হয়েছিল অনলাইন *মঙ্গলধ্বনি*-তে। অনুজ বন্ধু বাধনের কাছে বিশেষভাবে শুকরিয়া জানাই। আর, এই সুযোগে প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির প্রকাশক সৈয়দ সাজ্জাদ আহমেদ এবং মোড়ক-উন্মোচন-অনুষ্ঠানের নেপথ্য সংগঠক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার সাহসী ছাত্রনেতা শ্রদ্ধেয় একরাম ভাইয়ের (একরাম হোসেন) কাছে। আর, জানিয়ে রাখি বেশ কিছু নথিপত্রসহ বইটার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ বেরুচ্ছে ২০১৩ বইমেলায় ঢাকার 'আগামী প্রকাশনী' থেকে।

*প্রথম আলো*তে কী ছাপা হয়, তা সবাই জানেন, কিন্তু কী ছাপা হয় না, সেটাও সবার জানা দরকার বলে এই কথাগুলো এখানে বলে রাখা। এর মধ্যে আমার নালিশও নাই, আক্ষেপও নাই। সাজ্জাদ ভাই এবং তৈমূর রেজার সাথে আমার সখ্যেরও কোনো প্রকার পরিবর্তন এতে করে ঘটে নাই। আমার তরফে সেই শঙ্কাও নাই। তাঁদের তরফেও সে সম্ভাবনা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রশ্নটা এখানে স্রেফ *প্রথম আলো*'র আর্থ-রাজনৈতিক চরিত্র বোঝার এবং তা প্রকাশের প্রশ্ন মাত্র। 'যা কিছু ভালো'র মধ্যে যে বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রণীত বই এবং খোদ আমি পড়ি না, সেটা জানার গুরুত্ব অনুধাবন করার অবকাশ আছে বৈকি। ব্যক্তি নিউটনের সাথে যে *প্রথম আলো* নাই, কারণ তিনি 'যা কিছু ভালো'র সীমানা-বহির্ভূত।

ও দিকে উপর্যুপরি অনুরুদ্ধ হওয়ার পর বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম-এর 'মতামত-বিশে ষণ' সেকশনের জন্য জুলিয়ান অ্যসাঞ্জকে নিয়ে একটি লেখা দিয়েছিলাম। ছাপা হয়েছিল ২০১০ সালের ৮ই ডিসেম্বরে (দ্রষ্টব্য: http://opinion.bdnews24.com/bangla/2010/12/08/?????????-??-???/)। আশায় সে বার বুক বেঁধেছিলাম: যাক, দৈনিক পত্রিকা না ছাপুক, অনলাইন তো আছে! কিন্তু কীসের কী। পরবর্তী তিন মাসে আরো অসংখ্যবার অনুরুদ্ধ হওয়ার পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিচালিত সভাপতি-অপসারণের আন্দোলনের সময়, গত বছরের ৪ঠা এপ্রিলে বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম নামক অনলাইন-প্রতিষ্ঠানটিতেই পাঠিয়েছিলাম "রাবি নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ: যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ?" নামের একটা লেখা। কয়েক দিন সময় নিয়ে অবশেষে তাঁরা জানালেন: ছাপা হচ্ছে না। তার পর অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে আর লেখা পাঠাই নি মনের দুঃখে।

অতি সম্প্রতি, গত বছরের ৩০শে নভেম্বরে বিশেষ এক জনের অনুরোধে বাংলানিউজটোয়েন্টিফোরডটকম-এ পাঠিয়েছিলাম "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চরিত্র হচ্ছে তার স্বাধীনতা" নামের একটি রচনা। লিখিতভাবেই আগাম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম বিডিনিউজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে। তবু তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঠানোর পরে ছাপা হবে ছাপা হচ্ছে করতে করতে শেষে তাঁরাও জানালেন: ছাপা হচ্ছে না।

কারো নিন্দা করার জন্য এ সব কথা এখানে তুলছি না। যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কখনোই আমার কোনো রচনা-অনুবাদ ছাপেন নি তা কিন্তু নয়। অবশ্যই ছেপেছেন: যখন তাঁদের সীমার মধ্যে এঁটেছে। এঁরা সবাই আমার বিরুদ্ধে বা স্বাধীন মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, কিংবা আমি নিজে ইদানীংকালে বিরাট কোনো অশ্বডিম্বে পরিণত হয়েছি – মোটেও তা নয়। এটুকুই শুধু বলতে চাইছি যে, আপাদমস্ড়ক ভিন্নমতহীন এক চকচকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ। স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের ব্যক্তিগত তথা সামাজিক ইতিহাস তাই টুকে রাখা দরকার বটে, যেন আমরা বুঝতে পারি সত্যিকারের, আনসেন্সরড স্বাধীনতার গুরুত্ব কী। নিজের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই আমাকে আজ শিখতে হচ্ছে: ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতাই হলো প্রকৃত গণতন্ত্র। আমি জানি, পাঁচ খুটির মুক্তবাজার সাংবাদিকতার ঐ দালানটা কোনো নিশ্ছিদ্র কংক্রিটের চাঁই নয়। জীবিকার দায়ে যাঁরা এর ভেতরে আছেন তাঁরা তো মানুষই বটেন। এবং সকল মানুষই পরিপূর্ণ দাসত্ব অবলম্বন করতে এখনও হাজার বছর বাকি। আমি নিজে অথবা রাজশাহীর দৈনিক *সোনার দেশ* পত্রিকা ঐ কংক্রিটের দালানের ভেতরকার ফাঁকফোকরগুলোকে কতটা কাজে লাগাতে পারি অথবা পারেন, তার ওপরই নির্ভর করবে আমাদের সার্বিক মুক্তির ভবিষ্যত। *সোনার দেশ*-এর কাছে তাই শুকরিয়া জানাই। আর পাঠককে বলি: ভিন্নমতহীন মিডিয়ার যুগে আনঅফিসিয়ালি সেন্সরড এক লেখকের ভূবনে আপনাকে স্বাগত।

রাবি: ১৩ই জানুয়ারি ২০১৩

সেলিম রেজা নিউটন: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

টেলিভিশন: একটি নিত্যব্যবহার্য 'ইডিয়ট বক্স'

খ. আলম

টেলিভিশন একটি অত্যন্ড় শিক্ষামূলক মাধ্যম কারণ কেউ যখন আমার পাশে টিভি দেখতে বসে, আমি তখন অন্য র"মে গিয়ে পড়তে বসি। – গ্র"চো মার্কস (১৮৯০-১৯৭৭), জনপ্রিয় মার্কিন কৌতুক অভিনেতা

জনশ্র"তি আছে, পৃথিবীর সব জ্ঞানীরা নাকি একইরকম ভাবেন, হয়তো তাই অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর বাসায় টিভি রাখেন না বলে প্রচার আছে এবং কাজে কাজেই আর পাঁচ জনের চাইতে বেশি সময় পড়তে বসার ফুসরত পেয়ে তিনি আমাদের সমাজের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত! কিন্তু নিজেকে কার্ল মার্কসের একজন বিশুদ্ধ অনুসারী হিসেবে আত্মপ্রসাদে কাল-কাটালেও তাঁর পরিবর্তে গ্র"চো মার্কসকে উদ্ধৃত করে প্রকারান্ড়রে গুর"র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছি এই ভরসায় যে, মৃত ব্যক্তির গুর"দক্ষিণা চাওয়ার মুরোদ নেই। অবশ্য আমাকে খানিকটা উদ্ধার করতে পারেন ব্রিটিশ কবি ও সাহিত্যিক রোল্ড ডাল (১৯১৬-১৯৯০)। গ্র"চো মার্কস এবং আমি - আমাদের যৌথ স্বরে সুর মিলিয়ে তিনিও যখন বলেন, 'So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can install, a lovely bookcase on the wall.'

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম দিককার সবগুলো উদ্যোগই নিয়েছিলেন সঙ্গত কারণেই ইংরেজ বণিকরা। উদাহরণ হিসেবে উইলিয়াম বোল্টস (১৭৬৮) এবং অগাস্টাস হিকি'কে (১৭৮০) টেনে (হিঁচড়ে) আনা যায়। উলি খিত ব্যবসায়ীদ্বয় (লবণ ও অন্যান্য) বাহানা হিসেবে খবরের কাগজ না থাকার ফলে ব্যবসার কী কী ক্ষতি হচ্ছে কিংবা খবরের কাগজ থাকলে ব্যবসার আরও কী কী লাভালাভ হতো তার ফিরিস্ড়ি দিয়ে তা প্রকাশের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরেন বারংবার। ফলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে খবরের কাগজের সাথে বাণিজ্য বিস্ড়ারের একটি ঐতিহাসিক হরি-হর সম্পর্কের হদিস পাই আদি উদ্যোক্তাদের বয়ান থেকেই। সময়টা ছিল তখন অনেকটাই চাঁছাছোলা তাই হালের সংস্কৃতিসেবীদের মতো কায়দা করে কথা কইতে (যেমন ধর"ন, বদলে দাও-বদলে নাও কিংবা সত্য প্রকাশের দুরন্ড় দুঃসাহস ইত্যাদি) পারেননি তখনকার পত্রিকাওয়ালারা। সোজা কথা সোজা-সাপ্টাভাবেই বলেছেন তারা। প্রধানত পণ্য-বিপণন-বার্তা হিসেবে তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করাটা খুব জর"রি ছিল। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন পরবর্তীতে বিষয়টিকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান তাঁর 'মুদ্রণ-

পুঁজিবাদ' ধারণাটির মধ্য দিয়ে। অ্যান্ডারসনের বরাতে আমরা জানতে পারি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে মুদ্রণ-প্রযুক্তি বিশেষত সংবাদপত্র কীভাবে একটি 'কল্পিত-সম্প্রদায়' তৈরি করে আধুনিক জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রকাঠামোর পক্ষে ওকালতি করে যাচ্ছে। অবশ্য কানাডিয়ান তাত্ত্বিক হ্যারল্ড ইন্নিস তারও খানিকটা আগে সভ্যতার বিবর্তন ও বিচলনে মুদ্রণমাধ্যমের ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করে 'যান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদ' ধারণাটি বাজারজাত করে যান।

কিন্তু শতক ঘুরতে-না-ঘুরতেই মুদ্রণমাধ্যমের রাম-রাজত্বে রাবণের ভূমিকায় চলে আসে নয়া তথ্য-প্রযুক্তি। যেটি পরবর্তী সময়ে তথ্য-বিপ বের অভিধাপ্রাপ্ত হয়। আর কারও কারও কাছে এ বিপ বের অভিঘাত এতটাই তুঙ্গস্পর্শী যে, পৃথিবীর অন্য কোনো পূর্বতন বিপ বকে এ কাতারে ঠাঁই দিতেও নারাজ তাঁরা। এই নিমরাজিওয়ালাদের মধ্যে জোসেফ এল ডাইওনি অন্যতম। তিনি মনে করেন, শিল্পবিপ ব দুই শতকে যে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে, তথ্য-বিপ ব গত দু'দশকেই তা সম্ভব করেছে। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে পুঁজি-প্রযুক্তি ত্বরিত বনে যায় মাসতুতো ভ্রাতা। নিন্দুক-মহল অবশ্য বসে থাকেনি। পুঁজি-প্রযুক্তি'র এ ত্বরিত মিতালিকে 'যান্ত্রিক-পুঁজিবাদ' উপনামে ডাকতে কাল-বিলম্ব করেননি তাঁরা। ডগলাস কেলনার (১৯৪৩) আবার এককাঠি সরেস! তিনি আরও একধাপ এগিয়ে যান্ত্রিক-পুঁজিবাদী এ যুগে টেলিভিশনের কেরামতিতে মুগ্ধ হয়ে তার ওপর ইমামতির আলখাল া চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় টেলিভিশন হচ্ছে, 'ভ্যানগার্ড অব টেকনো-ক্যাপিটালিজম'।

নব্বই পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী টিভি চ্যানেলের রমরমা প্রসারের শতেক কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি কারণকে ওয়াকিবহালদের কেউ অবজ্ঞা করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। স্পষ্টতই, 'কাছাখোলা অর্থনীতি' কিংবা ভদ্রস্থ ভাষায় 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'কেই ইঙ্গিত করছি। ডেভিড পেজ ও উইলিয়াম ক্রাওলিসহ অন্যান্য তাত্ত্বিকরা অবশ্য আরও কয়েকটি কারণকেও এ ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা দিতে কার্পণ্য দেখাননি। সোভিয়েত ইউনিয়নকেন্দ্রিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙ্গন, তথ্য-প্রযুক্তির শনৈ শনৈ উন্নতি, দ্র তধাবমান আর্ন্তজাতিক পুঁজির পুঞ্জীভবন ইত্যাদি কারণসমূহও বিশেষভাবে উঠে এসেছে তাঁদের ব্যাখ্যা-বয়ানে। বাদ-বাকি বিশ্বের মতো একই গ্রহের বাসিন্দা হিসেবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও প্রায় অভিন্ন। কেবল যুক্ত হয়েছে কয়েকটি স্থানিক কারণ। নব্বই'র পরে নব্য-উদারনৈতিক অর্থনীতির ছত্রছায়ায় বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা কথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। আর এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত/সুশীল সমাজ গণতন্ত্রকে খুঁজতে থাকে বাক-প্রকাশের স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণ, আরও সুর্নিদিষ্ট করে বললে সোনার-বাক্সের মধ্যে। বলে রাখা ভাল, বাক-স্বাধীনতাকামী এই বকধার্মিকদের কাছে 'বাক-স্বাধীনতা' মানে প্রচল স্রোতের বাঁকে নিজ শ্রেণিস্বার্থের অনুকূলে কথা কইবার সুযোগ-সুবিধে। বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোকে খোল-

নলচে পাল্টে দিতে পারে এমন গণমুখী ও গণতান্ত্রিক (প্রকৃত অর্থে) কোন উদ্যোগকে ওই সব 'কথা-কইবার-স্বাধীনতাকামী' কিংবা গণ-নামধারী গণমাধ্যমের পক্ষেও যে শ্রেণী পক্ষপাতিত্বের জায়গা থেকে এস্কেড়মাল করা সম্ভব নয় – তার উদাহরণও আছে ভুরি ভুরি। যাক সে কথা। বলছিলাম, বাক-প্রকাশের স্বাধীনতা ধারণাটি এসেছে মানব-প্রগতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে, সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় নবজাগরণের হাত ধরে সামন্ড়-দাসত্ব ভেঙ্গে ব্যক্তিকে শৃঙ্খল-মুক্ত ও স্বাধীন করার প্রত্যয় থেকে। কিন্তু উদারনৈতিক এই ধারণাটি নব্য-উদারনৈতিক কালে এসে সামন্ড়-প্রভুর পরিবর্তে পুঁজির দাসে পরিণত হয়েছে। ফলে অপরাপর গণমাধ্যমের মতোই টেলিভিশন গণমানুষের পরিবর্তে পুঁজির প্রচারমাধ্যমে পরিণত হয়েছে যাকে ডগলাস কেলনার বলছেন, 'যান্ত্রিক-পুঁজিবাদের ইমাম'।

আমরা জানি, পণ্য প্রসার কিংবা প্রচারে প্রয়োজন দক্ষ প্রচারমাধ্যম আর প্রচারমাধ্যম নির্মিত তারকা। নিঃসন্দেহে 'দৃশ্য-শ্র তি' মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন কাজটি করতে পারে অন্য যেকোনো মাধ্যমের চাইতে তুলনামূলকভাবে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ড় কলা-কৌশলে। আর দৃশ্যমাধ্যম হিসেবে এটি তৃণমূলের নিরক্ষর ভোক্তাটিকেও স্পর্শ করতে পারে সমানতালে, নানান কায়দা-কানুনে। ভোক্তা/ব্যবহারকারীর আর্থিক অংশগ্রহণের জায়গা থেকে সংবাদপত্রের সাথে টেলিভিশনের রয়েছে একটি মৌলিক তফাৎ। অর্থনৈতিকভাবে টেলিভিশন ষোলআনাই নির্ভর করে কর্মাশিয়ালস অর্থাৎ কর্পোরেট সেক্টরের ওপর, অন্যদিকে সংবাদপত্র অংশত নির্ভর করে ব্যবহারকারীর ওপর। তাই টেলিভিশনের সাথে দর্শকের সম্পর্ক পরোক্ষ, বিপরীতে কর্পোরেট সেক্টরের সাথে প্রত্যক্ষ। ফলে দর্শকের কাছে টিভির জবাবদিহিতার বিষয়টি বিজ্ঞাপনদাতা হয়ে এক ধাপ ঘুরে আসতে হয়, যেটি তুলনামূলকভাবে সংবাদপত্রের সাথে খানিকটা সরাসরি। টেলিভিশনের সংশ্রব দর্শকদের সাথে কেবল ততটাই, বিজ্ঞাপনদাতাদের আকৃষ্ট করতে যতোটা দর্শক-প্রিয়তার জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রমাণ করা যায়। সংবাদপত্রের সাথে টিভির এ পার্থক্যটা সূক্ষ্ম কিন্তু তুচ্ছ নয়।

ফলে নব্বই'র গোড়া থেকে আমরা 'গণতন্ত্র-গণমাধ্যম' যুগলকে ব্যাপক মাত্রায় ব্র্যাকেটবন্দী অবস্থায় আবিষ্কার করতে শুর করি। সর্ব-সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অর্ধ-শতাব্দী পূর্তি উদযাপনের শে াগান – 'স্বাধীন গণমাধ্যমই গণতন্ত্র'। যদিও আমরা জানি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ধারণাটির একরৈখিক কোনো অর্থ হয় না বরং এটি অতি-অবশ্যই একটি ব্যাখ্যামূলক প্রত্যয়। মূলধারার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে মালিক, বিনিয়োগকারী, বিজ্ঞাপনদাতা ও কর্পোরেট শ্রেণীর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা মূলধারার গণমাধ্যমের চরিত্রকে গণমুখী করবে বলে মনে করার কোনো কারণই নেই। সীমাহীন স্বাধীনতা বরং কর্পোরেট গণমাধ্যমের মুনাফা কামানোর স্বেচ্ছাচারিতাকে উস্কে দিতে বাধ্য এবং তাতে প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর

কল্যাণের কোনো সুযোগ নেই। বরং আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক, সমন্বিত ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কর্পোরেট গণমাধ্যমকে সার্বক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে থাকা প্রয়োজন – তাতে যদিবা কর্পোরেট গণমাধ্যমকে কিছুটা দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার বেড়াজালে আনা যায়। সরকার ও গণমাধ্যম পরস্পর পরস্পরকে অষ্টপ্রহর প্রহরীর মতো পাহারা দেবে যেন উভয় পক্ষই তার দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা বিস্মৃত না হয়। প্রকৃত গণতন্ত্রে স্বাধীনতা যেমন একটি গুর"ত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তেমনি জবাবদিহিতাও তার এক অনিবার্য নিয়তি।

তো, যে আলোচনা চলছিল – নব্বই'র গোড়াতে বাজার-অর্থনীতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো বাংলাদেশেও আগমন ঘটলো কথিত গণতন্ত্রের। নয়া এ গণতান্ত্রিক পরিম"লে সময়ের দাবিতে সংবাদপত্র প্রকাশ সংক্রান্ড় 'বিশেষ আইন-১৯৭৪' বাতিল হয়ে যায় এবং অতিদ্র"ত গঠিত হয় বেসরকারীকরণ বোর্ড। ত্বরিত অনুমোদন পেয়ে যায়, বৈশ্বিক স্যাটেলাইট সম্প্রচার, মোবাইল নেটওয়ার্ক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমশ মধ্যবিত্তের চৌহদ্দি বাড়তে থাকে। বৈশ্বিক স্যাটেলাইট চ্যানেল ও অন্যান্য অনুষঙ্গ বাড়াতে থাকে তাদের অন্ড়র্গত স্বাদ-আহ্লাদও। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নিজস্ব স্বপ্ন-কল্পনা। আহা আমাদেরও যদি থাকতো! ফলে আর দেরি কেন? ইতিমধ্যেই হিসেব-নিকেশ ফয়সালা। ১৫ কোটির বাজার বলে কথা! বাজার অর্থনীতির যুগে বাজারের সাইজ জানা এবং সেমতো করণীয় নির্ধারণ করাইতো হবে চলমান গণতন্ত্র তথা উন্নয়নের মূলমন্ত্র। পালাগুম্মি সাইনাথরা বলুক গে, 'মূল সমস্যাকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়াই হচ্ছে উন্নয়ন'। আমরা সে কথায় কান দেব কোন দুঃখে!

তো বাজারের সাইজটা যেহেতু পাওয়া গেল, সুতরাং গণতন্ত্র সুরক্ষা এবং উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে একের পর এক গণমাধ্যম চাই। আর একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তো আর প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে হবে না, দরকার নিত্য-নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল। কেননা, উন্নয়নের জোয়ার ডিজিটালি পৌঁছে দিতে হবে জনগণের দোর-গোড়ায়। সাড়ম্বরে শুর" হয়ে গেলো জেমস কারানের ভাষায়, 'মার্কেট ওরিয়েন্টড জার্নালিজম'। বিজ্ঞাপনদাতা-গণমাধ্যম যৌথ সমঝোতার ভিত্তিতে অডিয়েন্স নিয়ত ভোগ করে চললো সংবাদরূপী পণ্য যাকে বলে 'কমোডিফিকেশন অব নিউজ'। ইয়ুর্গেন হাবেরমাস চিহ্নিত অষ্টাদশ শতকের কথিত 'জনপরিসরের' পরিবর্তে ছোট পর্দায় তৈরি হতে থাকলো একটি বৃহৎ 'খাদক-পরিসর'। বিচিত্র কলা-কৌশলে কর্পোরেট ও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ সুরক্ষার দক্ষ ওয়াচডগ কিংবা প্রহরীর পরিচয় দিতে থাকলো মাধ্যমটি। সংবাদের আড়ালে নিরবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করে সর্বোচ্চ পুঁজিবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্রকেও এ ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল। ফেডারেল কম্যুনিকেশন কমিশনের (এফসিসি) নীতিমালা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে প্রাইম-টাইমে

ঘণ্টায় আট মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করা নিয়মবর্হিভূত, সেখানে উল্টো রথে চলছে স্বদেশ। বিজ্ঞাপন দখল-বেদখল-পুর্নদখল করে নিচ্ছে টিভি অনুষ্ঠানের শিরোনাম; নির্ধারণ করে দিচ্ছে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, অনুষ্ঠান প্রচার-সময়, সংবাদ নির্বাচন এমনকি সংবাদ-কাঠামোটিও। ইনফোটেইনমেন্ট (ইনফরমেশন+এনটারটেইনমেন্ট)-ই হয়ে দাঁড়াচ্ছে টিভি চ্যানেলের প্রধান ও একমাত্র কাজ। আর একমুঠো এনটারটেইনমেন্টের মধ্যে এক চিমটি বাজার-সংশি ষ্ট ইনফরমেশন দর্শনে যেকোনো দর্শক মনে করতে পারেন, টিভির একমাত্র কাজ হচ্ছে – এনটারটেইনমেন্ট, এনটারটেইনমেন্ট অ্যান্ড এনটারটেইনমেন্ট। দয়া কিষাণ থুজু ভারতীয় প্রেক্ষপটে যেটিকে সনাক্ত করেছেন, 'মারডকাইজেশন অব নিউজ' (Murdochization of news) বলে। এদিকে শুধু নিজ মাধ্যমের অনুষ্ঠান নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি স্যাটেলাইট চ্যানেল, সংস্কৃতি-সেবা-সম্প্রসারণ-নীতির অংশ হিসেবে 'শ ীল/র"চিশীল চলচ্চিত্র' নির্মাণেরও গুর" দায়িত্ব পালন করে চলছে। ফলে টিভি চ্যানেল প্রযোজিত ও পরিবেশিত চলচ্চিত্র দর্শকদের সাথে চলচ্চিত্র ও নির্মাতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ কর্পোরেট কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করে চলছে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে। চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও পরিবেশক দর্শক-শ্রোতার কাছে দায়বদ্ধ না থেকে, থাকছে বাণিজ্যিক কর্পোরেশনের কাছে। ফলে সঙ্গত কারণেই সিনেমা হল ভেঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে নিত্য নতুন শপিং মল। দ্র"তই সিনেমা হলের সংখ্যা দেড় হাজার থেকে নেমে ঠেকেছে তিনশ'র কাছে-পিঠে।

কথিত আছে, মালিক শ্রেণির কালো টাকা সাদা করা এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল কিংবা প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করা নিত্য-নতুন টিভি চ্যানেল আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। বলাবাহুল্য, 'কালো টাকা সাদা করা' ধারণাটির মধ্যে বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট। কালোকে নেতিবাচক এবং সাদাকে ইতিবাচক প্রতীকে দেখানোর এটি একটি অসংবেদনশীল প্রয়াস। ফলে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতি মেয়াদে নিদেনপক্ষে ডজন খানেক চ্যানেলকে অনুমতি দিয়ে নিজ নিজ দলকে সুরক্ষা দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার। আর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিক সমিতিকে স্যাটেলাইট চ্যানেল নীতিমালা তৈরির দায়িত্ব দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোকেই আশু কর্তব্য বলে বিবেচনা করছে সরকার। ইতোমধ্যেই দুই ডজনেরও বেশি চ্যানেল দশর্ক-সেবা করার সুযোগ পেয়েছে আর ক্রমশ থিতিয়ে পড়ছে মধ্যবিত্তের পূর্বতন সব দাবি-দাওয়াসমূহ: বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন, সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন ইত্যাদি। এত সব স্বদেশি চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও সুশীল মধ্যবিত্তের চেতনায় এখনো নোঙর গেড়ে আছে ভিনদেশি চ্যানেল। সন্ধ্যার পর ঢাকার যেকোনো মহল ার গলি-ঘুপচিতে প্রবেশ করলেই কর্ণরন্ধ্রে অনায়াসে সুড়সুড়ি মিলবে বিভিন্ন ভারতীয় বাংলা (জি, জলসা, ইটিভি, তারা, সঙ্গীত ইত্যাদি) স্যাটেলাইট চ্যানেলের। আর হিন্দির ক্রমবর্ধমান দাপটে

বাংলা ক্রমশ পরিণত হচ্ছে একটি বান্দি (বাংলা+হিন্দি) ভাষায়। অথচ বাঙালি বা বাংলাদেশি কোনো প্রজাতির জাতীয়তাবাদীদেরই এ নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয়নি কখনও। আর অন্যদিকে গঙ্গা, তিস্ড়া আর সীমান্ড় ইস্যুর মতো অসমাপ্ত, অকার্যকর আর অনুচ্চারিত রয়ে গেছে ভারতে বাংলাদেশি টিভি সম্প্রচারের বিষয়টিও। উভয় দেশের কর্তাব্যক্তিরা মাঝে মাঝে মুখ খোলেন বটে, হয়তো বাকি পুরো সময়টা কুলুপ এঁটে রাখার জন্য। প্রচার আছে, পশ্চিমবঙ্গের কেবল আপারেটররা বাংলাদেশি চ্যানেল মালিকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা দাবি করছে নয়তো সম্প্রচার করবে না বলে সাফ জানিয়েছে। আর বাংলাদেশের চ্যানেল মালিকরা মনে করছেন, ওটা কস্ট-ইফেকটিভ হবে না। সমালোচকরা অবশ্য বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার বিস্ড়ার ঠেকাতেই দেব-দিচ্ছি বলে ওপার বাংলার এ লুকোচুরি।

মাওবাদী ও ভারত সরকারের একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অর“ন্ধতী রায় ২০১০ সালে শুর“র দিকে ভারতের ছত্তিশগড়ের দান্ড়েশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলেন। সমস্যা সমাধানকল্পে স্থানীয় পুলিশ সুপার অর“ন্ধতী রায়কে একটি প্রস্ড়াব দেন। প্রস্ড়াবটুকু পুলিশ সুপারের মুখেই শোনা যাক, 'দেখুন ম্যাম, খোলাখুলি বলি, এই সমস্যার সমাধান পুলিশ বা সেনাবাহিনী দিয়ে হবে না। এসব উপজাতীয়দের সমস্যা হলো, তারা লোভ বোঝে না। তাদের লোভী করে তুলতে না পারলে আমাদের কোনো আশা নেই। আমি আমার বসকে বলেছি, বাহিনীগুলো সরিয়ে নিন আর প্রত্যেক আদিবাসীর বাড়িতে একটি করে টেলিভিশন দিয়ে দিন। দেখবেন, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'। ফলে লোভী করে তুলতে যে টেলিভিশনের বিকল্প নেই সেটা বুঝতে পারা খোদ ছত্তিশগড়ের পুলিশ সুপারের কাছেও জলবৎ-তরলসম।

তবে কি এ কারণেই টিভিকে 'ইডিয়ট বক্স' বলা হয়? পাঠক আপনাদের মধ্যে আমার মতো যারা অ-জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞানী রয়েছেন তারা হয়তো এমনটিই ভাববেন। হয়তো ভাববেন, আমারা নিজেরা ইডিয়ট বলে টিভি দেখি, নয়তো টিভি দেখতে দেখতে এক সময় নিজেরাই ইডিয়ট বনে যাই? ধাঁধাঁ বটে! তবে ইডিয়ট বক্সটি সত্যিই গোটা মানব জাতিকে যে এন্ড়ার সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা খানিকটা উন্মোচিত হয় সম্ভবত এই কথায় – 'The human race is faced with a cruel choice: work or television'।

খ. আলম: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের ঝোঁক ও প্রবণতা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

রোবায়েত ফেরদৌস

> "If there's anything that's important to a reporter, it is integrity. It is credibility."– *Mike Wallace*
>
> "If I had my choice I would kill every reporter in the world, but I am sure we would be getting reports from Hell before breakfast."
> – *William Tecumseh Sherman*

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে এখন দু'ডজনেরও বেশি টেলিভিশন তাদের সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে; বিটিভি যাত্রা শুর“ করেছিল ১৯৬৪ সালে, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্ড়ানে; তবে এর চরিত্র কী দাঁড়াবে তার জানান দেওয়া হয়েছিল উদ্বোধনী দিনেই; সামরিক শাসক আইয়ুব খান যখন ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধন করছিলেন ঠিক সেই সময়ে পল্টনে বিরোধীদলীয় নেত্রী ফাতেমা জিন্নার সমাবেশে চলছিল আইয়ুব খান এর বির“দ্ধে গণ-অসন্ড়োষ ও বিক্ষোভ। টিভিতে সেদিনের সংবাদ পরিবেশনায় সরকারবিরোধী ওই কর্মসূচির ছিটেফোঁটাও প্রচার হয়নি। আজ চার যুগ পরে এসে যদি বিটিভির সংবাদ পরিবেশনের ধরন ও আধেয় মূল্যায়ন করি, তাহলে বলতে হয়, সেই জায়গা থেকে বিটিভি এক ইঞ্চিও বেরিয়ে আসতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৯৭ সালে আঁতুড় ঘর থেকে শুর“ হওয়া বেসরকারি গণমাধ্যমের বেশ কয়েকটি, এখন বলা যায়, বেশ শক্ত ভিতের ওপর নিজেদের অবস্থান দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে; কয়েকটি চ্যানেল নিজেদের অবস্থান তৈরি করার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে; কয়েকটি চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে; কয়েকটির কার্যক্রম দেখে এই সংশয় জাগে যে, আদৌ তারা টিভি সাংবাদিকতার পেশাদারি মনোভাব নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিন্ড়া করছে কিনা। কনটেন্ট, টেকনোলজি ও প্রেজেন্টেশন – এই তিনটিই হচ্ছে টিভি সাংবাদিকতার প্রধান দিক। একটি চ্যানেল অন্যটির চেয়ে প্রতিযোগিতায় কতটা এগিয়ে থাকবে বা পিছিয়ে পড়বে তা নির্ভর করে এই তিনটি বিষয়ের লাগসই ব্যবহারের উপর। এই লেখায় আমাদের টিভি মিডিয়ায় সংবাদ পরিবেশনের প্রধান কিছু ঝোঁক ও প্রবণতা সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা কাটিয়ে উঠে কীভাবে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাকে আরো দূর অবধি এগিয়ে নেওয়া যায় তার কিছু সুপারিশও উলে খ করা হয়েছে।

ইতিবাচক দিক

বিষয়-বৈচিত্র্য: সংবাদ পরিবেশনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিষয়-বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। চ্যানেলগুলোতে আগের যেকোনো সময়ের চাইতে এখন বহুমুখী, বহুমাত্রিক ও বিচিত্র সব বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। শেয়ারবাজার থেকে সেলিব্রিটি – জনআগ্রহের প্রতিটি বিষয়ই এখন সংবাদের উপাদান; জননিরাপত্তা থেকে জনদুর্ভোগ নিউজ ভলিয়্যুমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সবই; কৃষি থেকে কৃষ্টি – নিউজ কাভারেজ থেকে বাদ যাচ্ছে না কোনো কিছুই; সংবাদের ভলিয়্যুমও অনেক বেড়েছে; সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ, মানুষের অ্যাকসেস, অপশনস ও চয়েসেস বেড়েছে। মিডিয়ার 'ওয়াচডগ' বা 'সারভেইলেন্স' ফাংশন জোরদার হয়েছে। টিভি মিডিয়া সত্যিকার অর্থেই 'আই অন গভর্নমেন্ট' হয়ে উঠেছে; কোনো বিষয়ই এখন গোপন থাকছে না; সরকারের পাশাপাশি জনসম্পৃক্ত আছে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর মিডিয়ার নজরদারি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কাজের 'স্বচ্ছতা' ও 'জবাবদিহিতার কাঠামো' তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বলা হয় সময় এখন স্পেশালাইজেশনের; এর সঙ্গে তাল রেখে সংবাদেরও প্রচুর বিষয়ভিত্তিক স্পেশালাইজেশন ঘটেছে; এর সমান্তরালে অডিয়েন্সও 'সেগমেন্টেড' হয়ে গেছে; কেউ কেবলই স্পোর্টস কেউ-বা শুধুই শেয়ার মার্কেট বা ফ্যাশন সংবাদে আগ্রহী ও আসক্ত হয়ে উঠছে। সংবাদ পরিবেশনে কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসায়, আইটি ও শিক্ষামূলক বিষয়াদি যৌক্তিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। জিডিপিতে বিরাট অবদান রাখছে কৃষি, প্রায় ২০%, এবং প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে দেশের ৪৫-৪৮ ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত, তবু বাংলাদেশের মূল ধারার সাংবাদিকতায় কৃষি ছিল অবহেলিত। গেল এক দশকে তা পরিবর্তিত হয়েছে, কৃষি এখন সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কৃতিত্বের সিংহভাগ অবশ্যই শাইখ সিরাজ দাবি করতে পারেন।

উপস্থাপনা ও শৈলী: সংবাদ উপস্থাপনা ও শৈলীতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে; গ্রাফিক্স, ফুটেজ, অ্যানিমেশন, ভারকো, ভিডিও টাইলস, ইএনপিএস, ইন্টারেক্টিভিটি ও নানাবিধ প্রযুক্তির ব্যবহারে নতুনত্ব এসেছে। ঘটনা ঘটামাত্র অকুস্থল থেকে রিয়েল টাইমে চলছে সংবাদের লাইভ সম্প্রচার। সংবাদ পরিবেশন এখন আর ইউনিলিনিয়ার বা একমুখী কোনো বিষয় নয়; আগের যেকোনো সময়ের চাইতে এখন তা অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ। কেবল দ্বিমুখী নয়, অডিয়েন্স আর গণমাধ্যমের সম্পর্ক এখন বিচিত্র ও বহুমুখী; সংবাদের সঙ্গে নিয়ত অডিয়েন্সের মিথস্ক্রিয়া চলছে।

উন্নয়ন সংবাদ: পরিমাণ ও গুরুত্বের বিচারে টিভি চ্যানেলগুলোতে রাজনীতির খবরই সবার থেকে এগিয়ে, এরপরে আছে অপরাধ, ক্রীড়া সংবাদ; কিন্তু টিভি

চ্যানেলগুলোর গবেষণা বা অডিয়েন্স জরিপ করা উচিত যে, আদৌ অডিয়েন্স দুই নেত্রীর কিংবা দুই দলের নেতাদের পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া একই কথার তুবড়ি দিনের পর দিন শুনতে চায় কিনা? এসব সংবাদ জাতির স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে কোনো কাজে লাগে কিনা? মানুষের কাছে রাজনৈতিক ঝগড়া, বাক-বিতণ্ডা, সংঘাত-মারামারির খবর বেশি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে অডিয়েন্সকে হতাশাগ্রস্ত করা হবে, না কি মানুষের ভাগ্য পাল্টানোর সংগ্রাম, পরিবেশ, বিকল্প জীবন-জীবিকা তথা উন্নয়নের খবর দিয়ে তাদেরকে দেশ গঠনে উজ্জীবিত করা হবে – প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠানের আধেয় দেখলেই মিডিয়ার সম্পাদকীয় ঝোঁকটি কোন দিকে তা স্পষ্ট হবে। 'ডেথ-ডিজাস্টার'-এর বৃত্তাবদ্ধ কাঠামোকে পাল্টানো দরকার কিনা – টিভিগুলোর সময় এসেছে তা ভেবে দেখার। 'ব্যাড নিউজ ইজ গুড নিউজ' এই পুরনো আপ্তবাক্যের বিপরীতে 'গুড নিউজ ইজ গুড নিউজ' – বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সাংবাদিকতার এই চর্চাটিই জোরেশোরে শুরু করা জরুরি কিনা সে প্রশ্ন করবার সময় বোধহয় এসেছে। তবে এটা ঠিক যে, উন্নয়ন সংবাদ আগের চাইতে বেশি পরিমাণে পরিবেশিত হচ্ছে; তবে উন্নয়ন রিপোর্টের সত্যিকার যে দর্শন – গরিব, প্রান্তিক, সাধারণ মানুষের জীবন ও দারিদ্র নিয়ে সরেজমিন রিপোর্ট – সেখানে এখনো ঘাটতি আছে। সংবাদ পরিবেশনে তথ্যের ওপর বিত্তহীন-বঞ্চিত মানুষের অভিগম্যতা ও স্বত্বাধিকার এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে।

তরুণ প্রতিভা: সংবাদ সংগ্রহ, লিখন, তৈরি ও পরিবেশনের সঙ্গে অনেক তরুণ যুক্ত হচ্ছেন, তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখছেন; সংবাদভিত্তিক নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে; আরো ইতিবাচক যে, অনেক নারী তাদের পেশার প্রধান উপজীব্য হিসেবে সংবাদকে বেছে নিচ্ছেন এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন।

প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব: বাংলাদেশের টিভি মাধ্যমসমূহ এমন সক্ষমতা অর্জন করেছে যে কারণে দ্রুত খবর ছড়িয়ে দিতে পারে; ঘটনা ঘটা মাত্র মুহূর্তেই তা পুরো বাংলাদেশময় হয়ে যাচ্ছে; টিভি নিউজ বা টক শোর কোনো মন্তব্য টক অব দ্য কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে, অডিয়েন্সের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে, মানুষ এটা নিয়ে প্রত্যন্তগ্রাম বা শহরে তর্ক-আলোচনায় লিপ্ত হচ্ছে; রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য প্রতিদিন ইস্যু তুলে দিচ্ছে টিভির সংবাদ। অনেকে মনে করেন টিভিতে প্রচার হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মসূচির খবর এখন দ্রুত ও ব্যাপকভাবে জানানো সম্ভব হচ্ছে; ফলে জনগণের রাজনৈতিক সাক্ষরতার হার বাড়াতেও টিভি ভূমিকা রাখছে; কিছু রাজনৈতিক দল টিকে আছে স্রেফ টিভিকে উপজীব্য করে। টিভিতে নাগরিক সমাজের অনেক অনুষ্ঠান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করায় বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সিভিল সমাজের সদস্যদের কাজ করার আগ্রহও তৈরি হয়েছে।

দুর্বলতার দিকসমূহ

ইভেন্ট বনাম প্রসেস রিপোর্ট: এখন পর্যন্ড় টিভি সংবাদের মূল ঝোঁক 'ইভেন্ট রিপোর্টিং'-এর দিকে; দিনের ঘটনা দিনেই প্রচার করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু অন্য চ্যানেল থেকে সংবাদ পরিবেশনে স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা তৈরির জন্য 'প্রসেস' রিপোর্টিং'-এর কোনো বিকল্প নেই। নওগাঁয় ০৪ জন সাঁওতালকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এটা একটা ইভেন্ট রিপোর্ট, যা ওই দিনই কাভার করতে হবে, কিন্তু গেল ১০ বছরে নওগাঁয় কতজন সাঁওতালকে হত্যা করা হয়েছে, কতটি সাঁওতাল পরিবারের কত হেক্টর জমি বেদখল হয়ে গেছে, কারা এর জন্য দায়ী – এসব বিস্ড়ারিত তথ্য নিয়ে যে রিপোর্ট তাহলো প্রসেস রিপোর্ট। এই প্রসেস রিপোর্টের মধ্য দিয়েই আদিবাসীদের ভূমি দখল, তাদের দারিদ্র্য ও প্রান্ড়িকতার প্রক্রিয়াটি অডিয়েন্সের কাছে স্পষ্ট হবে। প্রসেস বা অনুসন্ধানী বা ডেপথ্ রিপোর্ট যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি তা ব্যয়বহুলও বটে। কিন্তু অন্য চ্যানেলের তুলনায় নিজের একটি আলাদা ইমেজ তৈরিতে এ ধরনের রিপোর্ট সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে; অধিকন্তু অডিয়েন্সের কাছে তা ওই চ্যানেলের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুর"ত্বও বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু আমাদের টিভি সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানী প্রতিদিন রিপোর্ট এখনও তার যথার্থ গুর"ত্বের জায়গাটি খুঁজে পায়নি।

জাত সাপ বনাম ঢোঁড়া সাপ: প্রতিদিন টিভির পর্দায় দেখি রিপোর্টাররা কেমন সাপের মতো তার-পেঁচানো-বুম নিয়ে হিস্হিস্ করতে থাকে; কিন্তু কই, তুলে আনা তথ্যে জাত সাপের মতো বিষ কই তাদের? সবই কেমন বিষহীন পানিবাসী নিরিহ ঢোঁড়া সাপ। তাদের কোনো দংশন নেই, কামড়ে দেবার শক্তি নেই; বিষ নেই, জ্বালাও নেই; কিন্তু বেশ বড়াই আছে, আছে নিরপেক্ষতার ভং; ভালোমানুষীর আবরণ, আবডাল। এজন্যই কি কামড়ে ভয়? কাউকে দংশন করলে পাছে যদি কোনো পক্ষ হয়ে যাই; কিংবা নিদেনপক্ষে ভয় থাকে, কেউ যদি কোনো পক্ষে মার্জিন এঁকে দেয়। নিত্যদিন এত সব মুখোশে টিভি সংবাদের মুখ মোড়া থাকা যে মুখোশ চিরে মুখ চেনাই মুশকিল হয়ে উঠে! মুশকিল হয় তখন। কখন? টিভি চালু হওয়ার আগেই এর মালিকের সঙ্গে সাংবাদিকদের যখন দেন-দরবার চলে, মহাআপসরফাটি তখনই সম্পাদিত হয়ে যায়। পরে আর কিচ্ছুটি করবার থাকে না, বেতনভোগী সাংবাদিকরা তাঁদের পেশাদারিত্ব দেখাবেন কোথায়? ক্ষমতাবানদের চ্যালেঞ্জ করবার সাহস ও শক্তি কয়টি চ্যানেল দেখাচ্ছে? অথচ সাংবাদিকতা মানেই সাপের গর্তে হাত দিয়ে সাপকে টেনে বাইরে আনা, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া, থলের বেড়াল কালো-সাদা যাই হোক বের করে দেওয়া। কোনো টিভি কি পারবে তাঁর মালিকের দুর্নীতি, ঋণখেলাপ, ভূমিদস্যুতা, হত্যা-অন্যায়ের বির"দ্ধে কলম ধরতে? একশো ভাগ সংশয়-ভরা-মন নিয়ে 'দেখিবার অপেক্ষায় আছি'।

অসুস্থ প্রতিযোগিতায় যথার্থতা বলি: সবার আগে নিউজ ব্রেক করবার চাপে যাচাই-বাছাই না করে অনেক সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়, যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাংবাদিকতায় 'সময়'এর গুর"ত্ব সবচেয়ে বেশি কিন্তু 'যথার্থতা'র

গুর"ত্ব তার চাইতেও বেশি। কিন্তু আমাদের টিভি মাধ্যমে ঝোঁক যতটা না তথ্যের অ্যাকিউরেসির, তার চেয়ে বেশি দ্র"ততার ওপর। টিভির ডেস্কে যারা কাজ করেন তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ঘাটতি যে রয়েছে তা স্ক্রলে দেওয়া শব্দ, বানান কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে প্রায়শই ফুটে ওঠে; আর ভুল হয়ে গেলে সে জন্য দুঃখ প্রকাশের বা সংশোধনের বিষয়টিতে অডিয়েন্সের দৃষ্টি আকর্ষণের সংস্কৃতি সংবাদপত্রে গড়ে ওঠলেও টিভিতে এই সংস্কৃতিটি এখনও গড়ে ওঠেনি। ঘটনার সংবাদমূল্য কিংবা সংবাদের তুলনামূলক গুর"ত্ব নির্ণয়ের জন্য সাংবাদিকতায় বেশ কিছু চলক রয়েছে; এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই কোনোটি ফার্স্ট লিড, সেকেন্ড লিড, উভ বা প্যাকেজ ট্রিটমেন্ট পায়; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, গুর"ত্বহীন অনেক সংবাদকেও ব্রেকিং সংবাদ বলে প্রচার করা হচ্ছে, যে সংবাদের হয়তো আদৌ ব্রেকিং খবর হওয়ার যোগ্যতা নেই। সংবাদ পরিবেশনে প্রতিযোগিতা সব সময়ই ইতিবাচক কিন্তু আন্ড়ঃচ্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তা সংবাদ পরিবেশনে – সততা, যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীনতা – এই চার মৌল নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। অসুস্থ প্রতিযোগিতার বিষয়টি অনেক সময় এমন ন্যাক্কারজনকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তা খোদ চ্যানেলটির র"চি ও বিশ্বাসযোগ্যতাকেও নাড়িয়ে দেয়।

দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা: সংবাদ পরিবেশনে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ দিক দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা; এর ওপর ভিত্তি করেই সাংবাদিকতার 'প্রফেশনাল ডিগনিটি' তৈরি হয়; কিন্তু আমাদের টিভি সাংবাদিকতায় 'ফেয়ারনেস' ও 'এথিকস'-এর সিরিয়াস ঘাটতি রয়েছে; যেমন, কারো বির"দ্ধে যত বড় অপরাধের অভিযোগ হোক না কেন, রিপোর্টে অভিযুক্তের বক্তব্য থাকতেই হবে; ধর্ষণের শিকার কোনো নারী বা তার নিকট আত্মীয়দের ক্যামেরায় দেখানো যাবে না, কোনো অপরাধে শিশু জড়িত থাকলে তার নাম-ছবি প্রকাশ করা যাবে না, রিপোর্টে প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত দেওয়া চলবে না, বেদনাদায়ক ঘটনা যা সে মনে করতে চায় না কিংবা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে এমন ঘটনায় শিশুর নাম-ছবি-কথা প্রকাশ করা যাবে না, বীভৎস ছবি, ঝুলন্ড় লাশের সরাসরি ছবি, বিকৃত ছবি, লাশের ক্লোজ ছবি দেখানো যাবে না; সংবাদ ও ছবি পরিবেশনে কারো প্রাইভেসির সীমা অতিক্রম করা যাবে না, কাউকে হুমকি-ধামকি বা ভয় দেখিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করা যাবে না; সংবাদে সবময়ই একাধিক সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে ইত্যাদি। সাংবাদিকের স্বাধীনতা মানে যা-খুশি তা বলা-দেখানো- প্রচার করা নয়; ভুলে গেলে ভুল হবে যে, 'ফ্রিডম ইজ নাথিং উইদাউট রেসপনসিবিলিটি'।

টাচ্ অ্যান্ড গো: চ্যানেলগুলোতে ২০/২৫ মিনিট ধরে লম্বা সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে; একেকটি বুলেটিনে সংখ্যার হিসেবে অনেক বেশি সংখ্যক 'নিউজ ইভেন্ট' কাভার করা হচ্ছে; ফলে কোনো সংবাদেরই গভীরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না; এক ধরনের 'টাচ্

অ্যান্ড গো' ধরনের সংবাদ পরিবেশন করেই চ্যানেলগুলো দায়সারাভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। কিছু সেমিনার, কতক কনফারেন্স, কিছু সড়ক দুর্ঘটনা, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দৌড়ঝাঁপ, দু-তিনটি মানব বন্ধন, আওয়ামী লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি কথার বস্ত্রহরণ – এই সব নিয়েই টিভি সংবাদের দিনরাত্রি। চলছে সিন্ডিকেটেড রিপোর্ট – একজনের রিপোর্ট অন্যরা ভাগাভাগি করে নিয়ে প্রচার করছে। রিপোর্টার বুম ধরছেন বিশেষজ্ঞের কাছে আর 'তিনি বলেন', 'তিনি আরো বলেন', 'এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন', 'তিনি জোর দিয়ে বলেন' – এই কাঠামোয় সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। 'কিছু একটা বলেন' – রিপোর্টারের এই অনুরোধে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কিছু একটা বলেন আর প্রতিদিন এটাই সংবাদ হয়ে যাচ্ছে। প্রেসক্লাব, রিপোর্টার ইউনিটিসহ বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংগঠন বিভিন্ন অদ্ভূত ব্যানারে প্রতিদিন অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন, এক দুজন মন্ত্রী নেতাদের আমন্ত্রণ করছেন আর টিভিতে এটা সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হচ্ছে, আয়োজকরা 'মন্ত্রী নেতাদের পাশে বসে আছেন এমন দৃশ্য টিভিতে দেখে' নিজেদের তৃপ্ত করছেন কিংবা পরিচিতি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এখানে রিপোর্টারের কৃতিত্ব কোথায়? অথচ আমরা জানি প্রতিটি রিপোর্টে রিপোর্টারের ঘামের গন্ধ থাকতে হবে, থাকতে হবে পরিশ্রমের নমুনা আর সৃজনশীলতার ছোঁয়া। রাষ্ট্রকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো, ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ী-কর্পোরেটদের চ্যালেঞ্জ করে চমকে ওঠার মতো কোনো রিপোর্ট নেই; যা জানি তাকেই হেভি মেক-আপ দিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। ফি-দিন টেলিভিশনগুলোয় হিমশৈলীর উপরে দৃশ্যমান বারো ভাগের এক ভাগই কেবল আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু আমরা যারা আইসবার্গের নিচের বারো ভাগের এগার ভাগ অর্থাৎ নিচে লুকোনো বড় অংশটা দেখতে চাই তাদের তথ্যক্ষুধা কিন্তু পূরণ হচ্ছে না একেবারেই। কোনো টিভিতে কেনো ক্রসফায়ার নিয়ে একটিও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এলো না? কেনো মিডিয়া র‍্যাবের একপেশে বক্তব্যই দিনের দিন প্রকাশ করছে? সাগর-রুনি'র ঘটনা নিয়ে কেন ইন-ডেপথ রিপোর্ট হচ্ছে না? দুদকের কাছে বিশ্বব্যাংকের চিঠি কেন সাংবাদিকরা লিক করতে পারলেন না? সুরঞ্জিত সেনের ঘটনার সেই ড্রাইভার আজম এখন কোথায়? ইলিয়াসের গুম হয়ে যাওয়ার তথ্য কোথায়? আমাদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যে কত দুর্বল এসব উদাহরণ তারই প্রমাণ!

আসল ইস্যু হারিয়ে যাচ্ছে: অনেক সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেমিনার বা আলোচনার আয়োজন করা হয়; কিন্তু সেগুলো বিষয় টিভিতে রিপোর্ট না হয়ে মন্ত্রী বা বিরোধী দলের কোনো নেতার রাজনৈতিক উক্তি, যেটা সেমিনারের ফাঁকে বা শেষে রিপোর্টাররা প্রশ্ন করে বের করে আনেন, যা সেমিনারের বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, তা দিয়েই সংবাদ করা হয়; এতে যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত টিভি সংবাদের বদৌলতে হয় তা-ই হারিয়ে যায়।

জটিল ইস্যুর সহজ ব্যাখ্যা: বিভিন্ন জটিল ইস্যুর ভালো ব্যাখ্যা সাধারণ অডিয়েন্স পাচ্ছে না; ভুলে গেলে ভুল হবে যে, শিক্ষাবঞ্চিত বা স্বল্পশিক্ষিত বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাদের পক্ষে সংবাদপত্রের ভাষা বোঝা সম্ভব না, তারা কিন্তু টিভির অডিয়েন্স; তাদের জন্য অর্থনীতি, পাটের জেনোম গবেষণা বা ক্লাইমেট চেঞ্জের মতো জটিল আর টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সহজ করে উপস্থাপনের দরকার আছে বৈ কি।

বড় ঘটনা কাভারে অপ্রস্তুত মিডিয়া: বড় কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা কাভার করতে আমাদের টিভি মিডিয়া এখনও ঠিক প্রস্তুত না; ঘটনার আকস্মিকতায় সাংবাদিকরা নিজেরাই বিহ্বল হয়ে পড়েন, খেই হারিয়ে ফেলেন এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এর বড় উদাহরণ বিডিআর-এর ঘটনা। শুরু থেকেই একপেশে খবর পরিবেশন করায় খবরের বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয়েছে, পরে অন্য পক্ষের তথ্য জানার পরে আগে প্রকাশিত খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কিছু সংবাদ ছিল 'উস্কানিমূলক' যা ঘটনাকে বরং আরো বাজে ও করুণ দিকে নিয়ে গেছে। এক ধরনের হুযুগে সাংবাদিকতার নমুনা সে-সময় আমরা খেয়াল করেছি। অধিকন্তু বিডিআর-এর ঘটনায় বীভৎস ও বিকৃত লাশের ক্লোজ ছবি যেভাবে দেখানো হয়েছে তাও সাংবাদিকতার নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। বিডিআর কাভার করবার ক্ষেত্রে কারো কারো সম্পর্কে 'এমবেডেড সাংবাদিকতা' করার কথাও উত্থাপিত হয়েছে। সাগর-রুনির ঘটনাতেও কিছু মিডিয়া সূত্র উলেখ না করে বিভিন্ন বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে বাড়তি সেনসেশন তৈরি করতে চেয়েছে, শিশু মেঘকে যেভাবে মিডিয়াতে আনা হয়েছে তাতে সাংবাদিকতার নীতিমালায় 'সিরিয়াস এথিক্যাল ব্রিচ' হয়েছে; একই কথা প্রযোজ্য নিহত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের ১৮ মাসের ঘুমের শিশুকে টেনে তুলে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসার বিষয়টিতেও।

উপেক্ষিত গ্রাম, আধেয় ও প্রযুক্তি দু'ভাবেই : কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে টেলিভিশন সংবাদে গ্রাম, গ্রামীণ জীবন, গ্রামীণ খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রাম, তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কিংবা তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা অনুপস্থিত। সাধারণ, প্রান্তিক, গ্রামীণ মানুষেরা সংবাদের কেন্দ্রে আসতে পারছেন না; ঢাকার বাইরের জেলাসমূহ বা গ্রামসমূহের সংবাদ পরিবেশনে প্রযুক্তিগত দুর্বলতাও লক্ষণীয়। আধেয়ের বিচারে তারা যেমন অবহেলিত, ছবির কোয়ালিটিতেও একই কথা প্রযোজ্য।

লোগো ছাড়া চ্যানেল চেনা মুস্কিল: টিভি সংবাদ পরিবেশনে বিষয়-বৈচিত্র্য এসেছে ঠিকই কিন্তু সব চ্যানেলে বিষয় বা পরিবেশন শৈলী মোটামুটি একইরকম। এক চ্যানেল থেকে আরেকটিকে ঠিক আলাদা করা যায় না। কেউ কেউ বলেন টিভির লোগো ফেলে দিলে কোন্‌টি কোন্ চ্যানেল অডিয়েন্সের পক্ষে তা সনাক্ত করাও শক্ত।

পৌনঃপুনিকতা আর পুনরাবৃত্তিতে ভরা: ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচুর বুলেটিন থাকে ঠিকই কিন্তু একটি বুলেটিন থেকে অন্য বুলেটিনে নতুন কিছু যুক্ত হয় না। ফলে একটি বুলেটিন

থেকে পরের বুলেটিনে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যও তৈরি হয় না। পৌনঃপুনিকতা আর পুনরাবৃত্তিতে ভরা থাকে সংবাদগুলো; অথচ একটু সৃজনশীল পথে হাঁটলে, একই সংবাদের বিভিন্ন অ্যাংগেল বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষজ্ঞের মতামত ও ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে একই সংবাদে নতুনত্ব ও বাড়তি তাৎপর্য যোগ করা সম্ভব।

মুখচেনা কতিপয় কর্তৃপক্ষ: মোটা দাগে আমাদের টেলিভিশন সংবাদ এলিটঅভিমুখীন, ধনীকঅভিমুখীন, শহর ও পুরুষঅভিমুখীন; দিনের পর দিন ঢাকা শহরের দেড় থেকে দু'শ মানুষই ঘুরে-ফিরে সব সংবাদের নির্মাতা, সোর্স বা অথরিটি হিসেবে উঠে আসছেন। নাটকের মুখচেনা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো সংবাদেও কিছু রাজনীতিবিদ, কিছু আমলা আর সিভিল সোসাইটির কিছু মুখচেনা সদস্যই সংবাদের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। মুখচেনা গবেষক, অর্থনীতিবিদ, এনজিও প্রতিনিধি কিংবা পরিবেশকর্মীর বাইরেও যে আরো অথরিটি আছেন সম্প্রচারিত টিভি সংবাদগুলো দেখলে তা বোঝার উপায় নেই; কেউ কেউ একে খুব যুৎসইভাবেই 'আমরা আর মামুরা' প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জেন্ডারের বিবেচনায় সংবাদে এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেওয়ার বিষয়টিও যারপরনাই অসংবেদনশীল – যেখানে অথরিটি হিসেবে প্রায় সবক্ষেত্রেই পুরুষকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। দেশে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, আইটি বিশেষজ্ঞ বা জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ হিসেবে অনেক নারী আছেন সংবাদ বা সংবাদভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান দেখলে তা বোঝার উপায় নেই।

ফলো-আপ উধাও: টিভি সংবাদের আরেকটি বড় দুর্বলতা সংবাদের ফলো-আপ না থাকা। একটি বড় ঘটনা অন্য ঘটনাকে 'আউটসাইন' করে দেবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সেসব ঘটনার ফলো-আপ অডিয়েন্সকে জানাতে হবে। ঘটনাকে দু-একবার তুলে এনে পরে ছেড়ে দিলে চলবে না; ঘটনার শেষ পর্যন্ড় ঘটনার পেছনে লেগে থাকতে হবে। 'বনখেকো ওসমান গনী' নিয়ে একসময় এত তোলপাড় হয়েছে, এখন তার কী অবস্থা, মামলার অগ্রগতি কী হলো? কোনো ফলো-আপ নেই। বলা হলো মাগুড়ছড়ায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতি হয়েছে; এত হাজার কোটি টাকার যে ক্ষতি সেখানকার পরিবেশ এখন কেমন? জীববৈচিত্র্য বা বৃক্ষরাজির কী অবস্থা? জনস্বাস্থ্যের ওপর কোনো প্রভাব এখনো আছে কিনা? আমাদের সাংবাদিকতা এসব বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ।

বেতন কম পিটিসি বেশি: সাধারণত এক্সক্লুসিভ সংবাদে পিটিসি দেওয়ার নিয়ম; এটা অনেকটা সংবাদপত্রের বাইলাইন স্টোরির মতো – যেখানে রিপোর্ট তৈরিতে রিপোর্টারের মেধা, শ্রম, নতুনত্বের স্বীকৃতি হিসেবে রিপোর্টে তার নাম দেওয়া হয়; কিন্তু অনেক চ্যানেল পিটিসি'র অপব্যবহার করে থাকে; সাদামাটা বা কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ক্ষেত্রেও পিটিসি ব্যবহার করে থাকে। কিছু সংবাদপত্রে যেমন বেতন-ভাতা ঠিকমতো না দিয়ে বলে 'কার্ড তো দিয়েই দিয়েছি, এবার করে খাওয়ার দায়িত্ব তোমার', জানতে

ইচ্ছে করে কিছু চ্যানেল পিটিসিকেও এই অর্থে ব্যবহার করছে কিনা? পর্যবেক্ষণ বলে, যেসব চ্যানেলে বেতন-ভাতা কম সেখানে পিটিসি বেশি; অনেক চ্যানেলে পিটিসি দেওয়ার ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষের চাইতে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভূমিকা রাখে বলে প্রতীতি জন্মে। কেউ কেউ একে 'মেন্টাল সাবসিডি' বা 'খ্যাতি-ভর্তুকি' হিসেবেও চিহ্নিত করে থাকেন।

ভাষা ও উচ্চারণ: উচ্চারণ ও শব্দ-বাক্যের ব্যবহার ও প্রক্ষেপণে রিপোর্টারদের দুর্বলতা লক্ষণীয়। সংবাদপত্রে দরকার না হলেও টিভি সাংবাদিকতায় এর প্রয়োজন অনপনেয়। একটি ভালো রিপোর্ট ভুল উচ্চারণ ও দুর্বল স্বরপ্রক্ষেপণের কারণে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে পারে। পাশাপাশি জেন্ডার অসংবেদনশীল শব্দ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

ক্যামেরাপার্সন: সেমিনার কাভার করতে গিয়ে ক্যামেরাপার্সনরা যেভাবে অডিয়েন্সকে তাদের ক্যামেরা দিয়ে আড়াল করে ফেলেন এটা পেশাদারি নমুনা নয়। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ক্যামেরাপার্সনদেরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

সৌজন্য-সংবাদ: অডিয়েন্সের দিক থেকে সংবাদে বিজ্ঞাপনের আধিক্য আরেকটি পুরনো অভিযোগ; শিরোনাম, বিভিন্ন সেগমেন্ট তো বটেই বিরতিও এখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে পণ্যের বিজ্ঞাপনের কাছে। পণ্যায়নের এই যুগে সব সংবাদই হয়ে যাচ্ছে সৌজন্য-সংবাদ; ২০ সেকেন্ডের সংবাদে ১২ সেকেন্ডের সৌজন্য-সিজি যাচ্ছে। কিছু চ্যানেলের ক্ষেত্রে বোঝা মুস্কিল সংবাদের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন চলছে নাকি বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে সংবাদ!

গণমাধ্যমের মালিকানা-কাঠামো: সংবাদ পরিবেশনের বিষয়টি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়; এর সঙ্গে গণমাধ্যমের মালিকানা-কাঠামো, মালিকের ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থ, রাজনৈতিক বিবেচনায় চ্যানেলের লাইসেন্স প্রাপ্তি, মিডিয়ার পলিটিক্যাল ইকোনমি, বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপ ও স্বার্থরক্ষা, সোর্সের সঙ্গে অপেশাদারি সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া, ক্ষমতাবানদের হুমকি-ধামকি-চাপ, সাংবাদিকদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা, হামলা-মামলা, দ্রুত এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে 'হিজরতজনিত অস্থিরতা', আন্ডারমিডিয়া কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, সেক্স-সেন্সরশিপ, সাংবাদিকদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়টিও যুক্ত; কখনো পরোক্ষ কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে এসব বিষয় একটি টিভি চ্যানেলের সংবাদ পরিবেশনের ঝোঁক, প্রবণতা ও গুণগত মানকে প্রভাবিত করে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন নেই: সংবাদ পরিবেশনের দুর্বলতার একটি বড় কারণ বেশিরভাগ চ্যানেলে সংবাদভিত্তিক রিসার্চ বা ইভালুয়েশন বিভাগ নেই। গণমাধ্যম রাষ্ট্র ও সমাজের বিবিধ ঘটনা 'পর্যবেক্ষণ' করে। পর্যবেক্ষণ করে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি। তাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ লেখা আর পরিবেশিত

শব্দ/ইমেজ থেকেই নির্মিত হয় নিত্যদিনের ইতিহাস; মিডিয়া সবাইকে চোখে চোখে রাখে ঠিক, কিন্তু মিডিয়াকে পর্যবেক্ষণ করবে কে? প্রতিদিন সময়ের সঙ্গে সাংবাদিকদের যুদ্ধ করতে হয়। ফলে যে সাত তাড়াতাড়ির মধ্যে তারা কাজ করেন, সেখানে থেকে যায় ভুলচুক-বিভ্রান্ড়ি আর একপেশে পর্যবেক্ষণ। এ ধারণা থেকেই সাংবাদিকতায় 'ওয়াচারদের ওয়াচ' করার বিষয়টি আজ প্রতিষ্ঠিত যেখানে সাংবাদিকদের প্রতিদিনকার দেখার বাইরে গিয়ে আরেকটি দল তাদের দেখা-লেখা-পরিবেশন কৌশলের যৌক্তিকতা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করেন। বলা যায় মিডিয়ায় এরা 'থার্ড আই' হিসেবে কাজ করেন, কাজ করেন 'প্রফেশনাল পর্যবেক্ষক' হিসেবে। গুণগত মান, সাংস্কৃতিক র‍ুচি আর দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চর্চার জন্য মিডিয়ায় অন্যান্য বিভাগের মতো স্থায়ী গবেষণা সেল বা বিভাগ থাকা তাই জর‍ুরি; প্রতিদিনের প্রচারিত সংবাদ সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। নিজের চ্যানেলের ভালো, বিশেষত্ব, ভুল, দেশ-বিদেশের অন্য টিভির সঙ্গে নিজের মিডিয়ার নিয়মত মূল্যায়ন পেশাগত উৎকর্ষের জন্য খুবই জর‍ুরি। কিন্তু বাংলাদেশের কয়টি টিভিতে এরকম গবেষণা বা মূল্যায়ন সেল আছে প্রশ্ন রইলো? গবেষণা সেল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিয়মিত দর্শক-শ্রোতা জরিপের কাজ করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ সেল: টিভি সংবাদ পরিবেশনে আরো পেশাদারিত্ব অর্জনের আরেকটি সমস্যা বেশিরভাগ টিভিতে সংবাদভিত্তিক প্রশিক্ষণ সেল নেই। নবীন সাংবাদিকদের উপযোগী করে তোলা, অভিজ্ঞদের জ্ঞান নতুনদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিরন্ড়র কাজ করার জন্য প্রত্যেক টেলিভিশনেরই নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেল থাকা জর‍ুরি। কেন্দ্র কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাংবদিকতার কলাকৌশল, নৈতিকতা, অনুসন্ধান কৌশল, আইনি বিষয়ে সচেতন করা এর উদ্দেশ্য। ইন-হাউজ সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতার বিভিন্ন গুর‍ুত্বপূর্ণ/বিতর্কিত/চলতি বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করা ও তাদের সামনে বিশ্ব সাংবাদিকতার হালনাগাদ ডিসকোর্স তুলে ধরার লক্ষ্যে নিত্য নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা ও তার বাস্ড়বায়নে উদ্যোগ নেয়া জর‍ুরি। বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইস্যু যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা পাটের জেনোম গবেষণার মতো বিষয়কে কীভাবে আরো সহজে অডিয়েন্সের কাছে হৃদয়ঙ্গম করানো যায় সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জর‍ুরি। প্রশিক্ষণের কাজে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরো প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা রাখা দরকার।

কোড অব এথিকস: সংবাদপত্রের জন্য প্রেস কাউন্সিল একটি কোড অব এথিকস তৈরি করেছে; কিন্তু টিভির জন্য কোনো কোড অব এথিকস নেই; এটি থাকা খুবই জর‍ুরি। প্রতিটি টিভি নিজেদের সাংবাদিকদের জন্য এরকম কোড এথিকস তৈরি করে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত করতে পারে। নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা ও স্বাস্থ্যকর

কর্মপরিবেশ নির্মাণের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশেই মিডিয়াগুলো অমবুডসপার্সন বা ন্যায়পাল নিয়োগ করে থাকেন। বাংলাদেশেও এর চর্চা শুর‍ু করা জর‍ুরি।

শেষে বলবো বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতা এখনও তার বিকাশের পর্যায়টি অতিক্রম করছে এবং অল্প সময়েই জনগণের কাছে বিশ্বস্ড় ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে উঠেছে। তবে নৈতিকতা, বস্ড়নিষ্ঠতা, গুণগত মান অর্জন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথে টিভি সাংবাদিকতাকে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে; এটি করতে হবে উন্নয়নের জন্য, মানুষের জীবনমান পাল্টে দেওয়ার জন্য, করতে হবে গণতন্ত্রকে সতেজ, টাটকা আর ফুরফুরে রাখার জন্য।

রোবায়েত ফেরদৌস: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: **robaet.ferdous@gmail.com**

Broadcast Journalism in Bangladesh and Its Future

Samia Rahman

Journalism in Bangladesh is lively with newspapers, broadcasting and new media operations in both private and public sectors. Although printing media in western world has declined recently, newspapers in Bangladesh are still thriving and playing a strong role in politics and society. There are hundreds of dailies in Bangladesh out of which few dozen are substantial and significant publications. This indicates that newspapers remain an important element of journalism in Bangladesh. However, the pre and post Y2K media boom in Bangladesh along with the growing expansion, availability and price drop of technology and internet has initiated extended use of new media among mass population of the country. Intensely new TV channels are in the business which made participation of audience both active and passive way in many discussions through new media and internet. What is happening in today's daily life in terms of news broadcasting, sharing of content and participation in discussion for decision making and understanding the credibility of news content was not even close to imagination a decade back in Bangladesh. It is thus apparent now that the traditional concept of journalism is far beyond the printing media or even the broadcasting media. Rather, since journalism is taking a new shift globally and for a mass populated country like Bangladesh, where journalism practice is rapid and demanding by the mass audience, it is clear that any major global shift in journalism will leave swift and positive impact on the way journalism is practiced in Bangladesh in the coming future. So an interesting question to ask now will be what trends are going to be effecting our media culture these days and how will journalism look like in 10 years? I would say smart print publications will realize that their online strategies are seriously tanking. Ad-relevance and revenues aren't significant or targeted

enough. Journalism online not only isn't creating the necessary affinity, So it is not surprising then, that citizen journalism has it beat hands down for three pretty compelling reasons: captures the long tail of content (instead of one-sized fits all journalism) it is emotional and personal, and speaks in a human language and user interfaces which reflect individuality and personalization. This is sometimes reflected by a new keyword and concept as "Journalism 3.0"- which according to me means an improvement of user centered design, interface and different social functions. Mobility and modularity are going to be two major trends of this kind of journalism. Of course mobile is making its way into, but I think this need to go way beyond the information delivery function. Recent trend in smart phone and tablet device in Bangladesh has rooted and initiated a big prospect of content delivery and sharing. New devices coming to market within two years' time period will show the concept of "Phablet" that is a device capable of working as phone or tablet will introduce more powerful mobile opportunities to mass population.

The ability to create custom feeds from other sources is an important issue that will be used more by journalists in coming years. An online publication can't be everything to everyone, but it can allow users to create their own experience. Those interfaces and communities which do the best job on the usability-helping users through the process via suggestions-personalization equation will win. Imagine use of such function on present prothom-alo.com website and compare with the existing prothom-alo.com website. Which one will be a winner and accepted more by the reader? Mass customization in the form of dashboards which reflect particular niches and geographies will be the next best thing happening to journalism world. Since the world is going global news from across the pond and the land of the rising sun are equally important and relevant. The proliferation of small video pods that are easily accessible and stream smoothly on numerous platforms (even old machines) is critical to creating micro-content that interests users. Crowd sourcing the creation of newspaper content, particularly in the area of video is an option and there are even several platforms which will edit video for a moderate price, rather than having to hire

a ton of videographers on staff. With the competitive price of IT labor in Bangladesh, this is just a matter of time to happen. While user generated content will soon play a large role in Bangladesh journalism field this will apparently decrease the duplication in stories so networks can cover a diversity of interesting and relevant local and human interest stories. Use of smart TV will be very popular in this decade in Bangladesh since their prices are dropping quickly in global market. These TVs are connected directly in to internet with the ability to browse directly which will create a big shift in how people will read news on TV. Journalism in Bangladesh will thus focus into creating more application to let mass population access towards these smart devices. It is clear that when the devices are changing, people are learning to use new design quickly and the prices of these devices are dropping it will affect the way we produce and deliver contents. Journalists produce contents and delivers them in a different manner not. With the mass population driving in to this big paradigm shift, journalism will be forced to take a shift with the help of these technologies that are more appreciated by the massive users in populated Bangladesh.

However there has been enough talk about the cancer spreading through modern journalism- the cutting of jobs and money, the shedding of audiences and disappearance of time for journalists to do some proper journalism. Regardless of these factors the new trend of journalism will create new opportunity for journalists. So how will the journalists of future be? Although journalism is a field where technology is definitely needed, efficiency of journalists is still more important for journalism. That is, his news sense, investigative mind, capability of investigation, getting proper information and visuals for news, his knowledge, his capability of control over language, situation, his interpretative attitude, his ethics and values are more essentials in doing journalism. My assumption is that these factors will highly boost up with the power of integrated technology and experienced personal knowledge to enhance the effect towards better journalism.Let's get the obvious ones out of the way first: the journalist of the future is a reporter, a video journalist, a photo-journalist, audio journalist and interactive designer, all-in-one. They

will shoot and edit films, audio slideshows, podcasts, vodcasts, blogs, and longer articles. They may have one specialism out of those, but can go somewhere and cover a story in a multitude of platforms. They don't just do it because it potentially means more revenue; they do it because they love telling stories in different ways. And let's get another thing straight: they still live and breathe the key qualities of journalism: curiosity, accuracy and a desire to root out good stories and tell the truth. The internet has shown we're just not prepared to pay for general news, especially when someone else is giving it away for free. The decline in newsrooms killed off many correspondents and specialists, but the journalist of the future should know there are more money and more audiences in a niche. So they will become more of a specialist in some areas, or use a current specialism to build an audience around what they do. The journalists who will be practicing the new trend of journalism thus will not belong to the world of "fortress journalism". They will not sit at their desk in a newsroom all day - in fact, they will work from home. They will use nodded working techniques to find collaborators for different digital projects; picking the most talented people from around the world. There are no office politics or long meetings. They market their work well enough to get chosen to take part in other projects. They will embrace new technologies, rather than view them as a threat. When a new social media tool will come along, they will ask themselves how I can use it. New trend of journalism will therefore create journalists who will do the thing all journalists have ever done: tell stories, but they will do it better that traditional journalists practicing traditional journalism because they are not so constrained by time or formulas. They will not be afraid to break some rules to make a good story. So the result of this new trend in reporting and journalism practice is therefore, more truthful, accurate and responsible journalists which Bangladesh needs badly all the time.

In conclusion, we should not forget that even though future is not the field for many of us, we still do not make plans for the past rather we always try to make plans for the future. And we tend to think future in a way which is informed by the past. The digital revolution which

is still unfolding in Bangladesh has already had a number of impacts in our media and journalism. With some fancy use of social media, video conferencing in limited way, an advance trend of journalism is visible now and then in Bangladesh. The shift from traditional journalism to this type of journalism took a long time for our society. But the shift from present journalism practice to the new global trend of journalism is simply a matter of time only. We can already see that it has started happening. In the age of this mass participation thus the news making will be easier to make together with audiences. In the age of huge data available for us to use, easier tools to visualize the data will be required. And in the age of this mass information we will need to find and share investigative reporting easier. These factors are serious for Bangladesh in this rush hour of globalization and glocalization. But we should also not forget that, as long as our journalists will maintain and act like professionals with global competence, they will get more chances to survive in this field in the coming time. Technology will be supporting our journalists for better and improved journalism or reporting, but technology itself cannot replace a good journalist. Proper use of technology is a key factor in Bangladesh. Several incidents can be exemplified to explain how people use technology negatively which is not going to be appreciated at all in the coming trend of journalism. So do not let machine take over your place and for that we the journalists need to be efficient and professional minded with the help of technologies. And this is for the sake of our own survival, for our complicated future job market. Thus the next best major factors that will leave foremost influences in the way people will be create, deliver and perceive news and media content and this is what I wanted to look into and describe through this article. These factors will take the present trend of journalism that is going on in Bangladesh, towards a fluency in the new media across different platforms. I, therefore, am optimistic and see a more nimble, flexible entrepreneurial future for journalism in Bangladesh.

Samia Rahman: Associate Professor, Dept of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka.

Bengali or Muslim?: Islam, Identity and Art Cinema in Contemporary Bangladesh

Zakir Hossain Raju

This essay is an effort of deconstructing how Bangladeshi art cinema, a national-cultural institution developed in a postcolonial nation-space in South Asia and addressed to a global audience, represents and interacts with Islam and Muslim identity. A glimpse at the colonial and postcolonial trajectory of Bangladesh and its people demonstrate that the identity formation of Bengali Muslims was never a linear process. Along side the indigenization of Islam and continuous transformations of local cultural practices, the British and Pakistani colonialism as well as the postcolonial State of Bangladesh played crucial role in constructing community identities in East Bengal/Pakistan and in Bangladesh. Sociologist Tazeen M. Murshid states,

The history of the region demonstrates that the process of identity selection was not constant; the cultural markers adopted were not fixed. ... Here, nationhood has been defined and re-defined three times within a quarter of a century (Murshid, 1997: 7).

In this way, the Bengali Muslims of Bangladesh are always formulating new, emerging and conflicting versions of Bengali-ness and Muslim-ness, which are not pure concepts, rather are always on the move. Within this framework, this article demonstrates how the cinematic texts produced and circulated as/under art cinema mode are engaged in constructing and reconstructing different identities for Bengali Muslims in contemporary Bangladesh. I argue in this paper that Bangladeshi art cinema, to a large extent, locates Islam as an alien culture, a 'foreign' religion that entered Bangladesh through political-military aggression. Following the cultural-nationalist pro-Bengali approach, the major tendency of Bangladeshi art cinema is to be anti-Islamic. Believing in an 'authentic' and anti-colonial but modern version of Bengali culture, they complain that Islam poses

certain threats to the development and dissemination of such preferred notion of Bengali-ness. In other words, most art cinema films are committed to a definitive national-cultural modernity, a modernity that normalizes the 'Bengali' identity as modern and secular, and locates the 'Muslim' identity only as a religious category that cannot be placed as/within everyday cultural lives of Bengali Muslims. The dominant thrust of Bangladeshi art cinema is then to represent Islamic practices as out-of-date and stereotypical rituals.

I find such tendency most visible in some well-known films of Morshedul Islam and Tanvir Mokammel, two major art cinema authors in contemporary Bangladesh. One can argue that as representatives of western-educated urban Bengali Muslims who produce, watch and critique the Bangladeshi art films, these two filmmakers utilized the discourse of art cinema to form a contrast between Islam and Bengali culture. Their films, produced and circulated during the 1980s-2000s and targeted to both national and global viewership, repeatedly show Islam as a singular and monolithic orthodoxy. These films theatracalize and exoticize Islamic practices as something ancient in/for contemporary Bangladesh, a rapidly modernizing and commercializing nation-state in the face of globalization. These cinematic texts thus create and maintain a clear-cut dichotomy between Islam and Bengali culture.

Bengali or Muslim?: The Conflict of Identities in Bangladesh

Though large-scale conversion to Islam started in Bengal since the thirteenth century, the conflict between Islam and Bengali identity started only in the late nineteenth century. This dichotomy got stronger because of the success of Islamic reform movements in rural Bengal as well as the subsidies provided by the British to Indian Muslims in order to turn them into a 'community'. Historian Asim Roy argues that the comprehensive outcome of the Islamic reform movements in nineteenth century Bengal was to create a chasm between Muslim's "Islamic" and "Bengali" identities… the persistent and vigorous insistence on a revitalized Islamic

consciousness and identity, with its corresponding denigration of Islam's local roots and associations in Bengal, sapped the very basis of the syncretistic tradition and of the Bengali identity in general (Roy, 1993: xvi-xvii).

The proponents of a pro-British, anti-Bengali and anti-Hindu version of 'Muslim' identity in colonial Bengal promoted the incompatibility of Bengali-ness and Muslim-ness and enforced pan-Indian Islamic brotherhood upon Bengali Muslims. The upper-class, non-Bengali and Urdu-speaking Muslim leaders of Calcutta like Nawab Abdul Latif and Amir Ali led this process of identity formation of Bengali Muslims in the late-nineteenth century. Geo-ethnic and cultural identity of Bengali Muslims that is Bengali-ness became negligible in this process, especially in a bid to get rid of the hegemonic umbrella of Bengali-Hindu identity. In a way, this pro-Arab notion of Muslim identity for Bengali Muslims strengthened the hegemonic notion that Bengali identity can accommodate Bengali-Hindus only, a notion established by modernist Bengali Hindus in colonial Bengal.

However, the emergent middle-class Bengali Muslims in the late nineteenth century were linked not only with the agricultural lands, but also with the indigenized version of Islam in rural East Bengal. The Arab-looking, Urdu-speaking elite Muslims with a pan-Indian Islamic view did not accept these Bengali-speaking rural Muslims as their 'real' brothers, though they wanted to accommodate them under the umbrella of Muslim identity. Opposing the Bengali-Hindu cultural modernity and the pro-Arab pan-Indian Muslim identity, the middle-class Bengali Muslims worked towards defining a modern cultural identity of/for Bengali Muslims. They felt strong affinity with their cultural root, that is Bengali-ness principally and visibly expressed through Bengali language as well as with their religious affiliation that is the indigenized Islam. In this way, by the beginning of the twentieth century a category called 'Bengali Muslim' identity came into discussion.

However, the Muslim-ness and Bengali-ness, the two conflicting identity discourses continued to serve as crucial incompatibility towards forming a viable identity for Bengali Muslims in different

historical junctures of the twentieth century. In the search of a modern identity for Bengali Muslims, middle class Bengali Muslims then used the Bengali/Muslim dichotomy differently in different times. This conflict inherent in Bengali Muslim identity served as constituent to the Pakistan State in 1947 and, in a different form, it also acted as the driving force for establishing the State called Bangladesh in 1971. In a similar manner, as I outline below, the key art cinema films in contemporary Bangladesh promote and advocate for a fixed notion of Bengali identity by putting it against Muslim identity.

Islam and Bangladeshi art cinema: Bengali/Muslim conflict on screen

The art cinema as a national-cultural institution rigorously participated in the identity debate of Bengali Muslims during last few decades. Drawing on certain realist idioms the modernist Bengali Muslims shaped the discourses around Bangladeshi art cinema, an art cinema that is quite different than what normally considered as art cinema in the West. However, by recording and representing the cultural-nationalist essence of Bangladesh through Euro-American cinematic narration, the Bangladeshi art cinema addresses the art-house audiences and critics in the West (the 'global' audience) and the westernized middle-class Bengali Muslims in Bangladesh. This art cinema, thus, is not (expected to be) appreciated by the ordinary, average cine-goers in Bangladesh, some (if not most) of whom are strong Islamic believers and live in small towns and rural areas where indigenized Islam is very much part and parcel of their everyday lives.

The genealogy of Bangladeshi art cinema as a cultural institution closely linked to western modernity confirms that this cinematic discourse mainly reconstructs and reinforces the Bengali/Islam dichotomy on cinema screens. Most of these films represent Islam as anti-modern and arcane using the unresolved identity question of/for Bengali Muslims as the basis. By discussing a number of globally-circulated films of two major authors of Bangladeshi art cinema:

Morshedul Islam and Tanvir Mokammel, below I demonstrate the tendency of this cinematic mode in negating Islamic practices.

Both Islam and Mokammel entered filmmaking in the mid-1980s through what has been marked as 'short film movement' in Bangladesh. This discourse comprises short features and documentaries on 16 mm and video, produced in artisanal mode with low budget outside the popular film industry. Amid rapid globalization and the strengthening of Muslim identity through State mechanism, the film club activists fostered this cultural-nationalist stream of visual culture in 1980s-90s Bangladesh. The short films were shown outside cinema theatres: among the friends, local groups, especially among the college-students and cultural activists. Two short features on the failed expectations of the 1971 liberation war: *Agami* (*Toward*, 1984) by Morshedul Islam and *Hulyia* (*Wanted*, 1984) by Tanvir Mokammel started the 'short film movement' in Bangladesh. The cultural-modernist leaders of this film movement like Islam and Mokammel received their education on film appreciation and production through watching European and American film classics. In an informal setting such as within the film clubs, they watched and discussed classic films from Europe and the US as well as the Indian art films following Euro-American method of cinematic narration. Therefore the films they produced during 1980s-2000s followed the textual forms of these foreign cinemas, especially of the Indian art cinema and Italian Neorealism. Using these western(-dervied) cinematic-textual norms, the films of Islam and Mokammel severely criticized the pro-Islam move of the postcolonial State in Bangladesh.

The 1971 liberation war and its cultural-nationalist ideals opposing pro-Pakistan discourse of Muslim identity come as a recurring theme in the films of these two authors. The first of these films, *Towards* started this trend. Morshedul Islam here visualizes the agonies of a liberation war veteran in 1980s Bangladesh using flash-back scenes. He juxtaposes how the Bengali-Muslim guerillas forgave and let the captive *Razakar*s (pro-Islam Bengali Muslim supporters of Pakistani army) flee during 1971 war and how the *Razakar*s punish the liberation war veterans in the 1980s. Morshedul

Islam's later films: *The Beginning* (*Suchona*, 1988), *The Wheel* (*Chaka*, 1993) and *The Rain* (*Bristi*, 1999) continued such cultural-modernist rewriting of the contested history of nation and identity in Bangladesh.

Morshedul Islam's *The Rain* can be read as a key text to understand how he positions Islam in contemporary Bangladesh. The story centres around a reverent Muslim old man in rural Bangladesh, his young bride and a young man he adopted as 'son'. The old man, *Hajishaheb* has considerable holdings of land and his religious and economic achievements made him powerful in the village. So nobody questions when he married for the fourth time and brought a young bride. However a clandestine love affair develops between the young bride and *Hajishaheb*'s adopted son, a young man who also follows Islamic learnings like his father. He also wears beards, Muslim cap and long punjabi with pyjamas understood as Islamic attire in Bangladesh. There is a drought in the village and *Hajishaheb* concludes that Batashi, a poor divorced woman who recently became pregnant is responsible for the long lasting drought in the area. He presides over a village court on the matter and as per the 'Islamic learning,' he puts forth the verdict that Batashi should be stoned to death for her extra-marital relationship. When the village meeting adjourns, the rain comes and *Hajishaheb* takes it as Allah's quick appraisal and returns home happily. He finds that his young bride is happily taking a shower under the rain. He cannot realize that she just had a sexual encounter with her lover, the adopted son of *Hajishaheb*, a message the viewers received through parallel editing during the scene of the village court.

The Rain reminds the viewers Morshedul Islam's first filmic endeavor: *Toward*. Though Islam made that film in 1984 almost fifteen years before he made *The Rain* in 1999, his portrayal of Islam and its opposite, the Bengali culture, are identical in both films. The appearance, attire and mannerism of *Hajishaheb* and the leader of *Razakar*s (the pro-Islam supporters of Pakistani junta during liberation war) in *Toward* almost same. Actually the same actor (Aly Zaker) was cast for both the roles. More importantly, we also find similar village court in *Toward* where the *Razakar*-leader imposes

cruel verdicts on poor women accused for adultery using the rhetoric of Islam. Similar to the suggestion of sexual intercourse between the young bride and the son of *Hajishaheb* in *The Rain*, Morshedul Islam also presented a playful love-making scene between a Bengali guerilla and his wife in a jungle in *Toward*.

Similar to films by Morshedul Islam, Tanvir Mokammel's films too contributed to sharpen the Bengali/Muslim dichotomy on screen. These films also portrayed, using different plots and narrative strategies, the conflict between the secular-modern and communal-Islamic forces in rural Bangladesh. Mokammel's *Modhumati, the Name of a River* (*Modhumati*, 1995) reveals this conflict in the form of a familial conflict between a hardcore Islamic father and modernist son while his *In the Bank of Chitra* (*Chitra Nadir Pare*, 1999) portrays the migration of bitterly disillusioned Bengali Hindus of East Pakistan to West Bengal in India in the 1960s amid the increasing Islamicization attempt of the Pakistan State.

In 2001 Mokammel made *A Tree without Roots* (*Lal Shalu*), a feature film based on the highly-respected Bengali novel of the same title, a novel that is in the syllabus of the secondary and higher secondary schools in Bangladesh for many years. This film depicts the rise and fall of Majid, a hypocrite *Mullah* (Islamic priest) who creates a false *mazar* (shrine) of an imagined *Pir* (Muslim saint) in order to collect money and gifts from the villagers. Jamila, his second wife, a playful rural girl rejects his authority imposed in the name of Islamic wisdom. Her rebellious acts make Majiid unsettled and display his vulnerability and powerlessness that he covered up by preaching Islam to the ordinary rural Muslims. Mokammel used many symbols in *A Tree without Roots* that show Islamic practices as of mediaeval practices. For example we see the *shalu*, that is the red coverings on the top of the false burial site of the so-called *Pir* (Muslim Saint) in many shots (including some close shots) in this film. Like *The Rain*, here also we see the marriage between aged Islamic practitioner man (Majid) and young playful woman (Jamila) unwilling to receive Islamic pedagogy. The Islamic 'court' at village level (for punishing unruly villagers) is also present in *A Tree without Roots* that we saw both in *The Rain* and *Wanted*.

Conclusion: 'Bengali-ness' as Battered but Brave Women?

The above glimpse at the major representational tendency of Bangladeshi art cinema discourse through the works of two major authors proves that middle class Bengali Muslims utilized art cinema to repeatedly stage and screen Islam as an orthodoxy that opposes the 'modern' identity of Bengali Muslims. Cultural-modernist art cinema authors like Morshedul Islam and Tanvir Mokammel clearly believe in straightforward separation between the Muslim and Bengali identity of Bengali Muslims. In their films they took a clear position on the side of the Bengali identity and even tested its boundary by emphasizing the issues like sexual intercourse, an issue normally treated as taboo even among modernist Bengali Muslims. These films present Islamic fundamentalists as a stereotype imposing the same mannerism and dress code on them. These films also repeatedly show us the innocent powerless female victims trapped in/by the so-called village court where they are subjected to the Islamic rhetoric against which they can exert no objection. Actually the character of Islamic fundamentalist as a middle-aged or oldish man, wears beards and Islamic dresses (e.g. long punjabi and pyjamas with cap), who cheats the ordinary villagers in the name of Islam is omnipresent in the films of Morshedul Islam and Tanvir Mokammel. The *Razakar*-leader in *Toward*, *Hajishaheb* in *The Rain*, Majid, the hypocrite *mullah* and his opponent, another *Pir*, in *A Tree without Roots*—all these characters basically represent an Islamic fundamentalist in different guises. These characters are built, in most cases, not as human characters with limitations and virtues. Rather they are shown as monsters who only plan and perform coercion, deceptions or evils to ordinary villagers using their Islamic clout.

As I have discussed above, their victims are mainly females and in most cases they are represented as innocent, youthful and playful girls who revolt against the restrictions imposed on them in the name of Islamic learning. *Hajishaheb*'s young wife and Batashi, the girl to be stoned to death in *The Rain*, and Majid's second wife Jamila in *A Tree without Roots* represent these kinds of woman-as-victim-and-

rebel characters. Unlike the Islamic fundamentalist men, these women characters are created more delicately and resemble with humane characters in real world: they are people with love and hatred and wish to live their life on their free will. Such opposition between Islamic fundamentalist men against freedom-hungry women-victims is played out in Bangladeshi art cinema films so recurrently that I would argue that this opposition is actually used to establish the Bengali/Islam dichotomy on cinema screens. In this sense the women-victims symbolize the vulnerable state of Bengali culture in 1980s-2000s Bangladesh amid the pro-Islam turn of the State power and the elite. However, this kind of oppressor-victim situation brings medieval feudalism on the cinema screen that easily rebukes Islam and Muslim identity for being anti-modern and outmoded. The Bangladeshi art cinema then, mostly abstains from portraying the multiplicities of/in Bengali Muslim identities and how Islam has been localized and became a part of everyday life of the Bengali Muslims. However, there are exceptions to every tendency, and in this case, at least one film I would like to mention that goes against the homogenization of Islam as done by most Bangladeshi art films. This is Tareque Masud's *Matir Moina* (*The Clay Bird*, 2002). Focusing on the world of a young madrasa student in 1960s East Pakistan, this autobiographical film of Masud visualized and presented Bangladeshi madrasas in the global stage.

Though I cannot provide a detailed reading of *The Clay Bird* here that I did elsewhere[2], I would like to point out that this is a film against the mainstream representational mode of art cinema based on Bengali/Islam dichotomy as visible in the texts created by Morshedul Islam and Tanvir Mokammel. *The Clay Bird* is one of the rare Bangladeshi art films that visibly and delicately represents Islamic education in/through the madrasa system in Bangladesh. The scriptwriter and director of the film, Tareque Masud, an important Bangladeshi art cinema author alongside Morshedul Islam and Tanvir Mokammel contributed to the critique of Muslim nationalism and the formation of cultural-national modernity among Bengali Muslims through his earlier films in the 1980s–90s. All these films

by Masud obviously prove that his filmmaking career and vision is also linked with the art cinema discourse and its clear-cut opposition against Islam in contemporary Bangladesh. But we do not find black-and-white rivalry between Islam and Bengali identity in Masud's film, *The Clay Bird*. What we get is a discursive take on Bangladeshi madrasa education that he represents through cinema aesthetics mostly learnt from Euro-American films. The madrasa-educated filmmaker Masud with the collaboration of his American-born partner, Catherine, created a film that rather urges to see the divide between Islam and Bengali culture as minimal and propose alternative perceptions of Islam in rural Bangladesh. Unlike most Bangladeshi art cinema films, *The Clay Bird* follows a different itinerary in developing and neutralizing the conflict between Bengali culture and Islam and represents Islam as heterogeneous and madrasas as places for learning heterogeneity, not as some fierce organizations working for Islamicizing Bangladeshi society.

I would like to remind that the identities like 'Bengaliness', 'Muslimness', 'Bengali-Muslimness' and 'Bangladeshiness' have been constructed, questioned and redefined in East Bengal/Pakistan and Bangladesh within last few decades. Each of these identities was imagined as natural and homogenous especially when these gained the status of a dominant discourse (e.g. Bengali identity in the 1960s). However, there were (and are) always overlaps and fissures between, and within, the identities. Historian Rafiuddin Ahmed says, The experiences of the Muslims of Bangladesh … point to the uselessness of trying to identify a fixed criterion for a definition of the cultural boundaries of such a community: a Bengali Muslim may have seen himself primarily as a 'Muslim' the other day, as a 'Bengali' yesterday, and a 'Bengali Muslim' today (Ahmed, 2001: 3-4).

In that case, one can say that the contemporary art cinema in Bangladesh is in search of a 'fixed criterion for a definition of the cultural boundaries' of Bengali Muslims or Bangladeshi Bengalis. One may ask: is this a useless exercise at this age of globalization when national borders are becoming meaningless, and identities are also becoming more and more hybridized and hyphenated? I would

point out that still such cinematic representations are important for foregrounding the struggle of Bengali Muslims towards articulating a suitable identity framework. The battered but brave women figures in art cinema films are then not only some characters devised to forward narrative conflicts, rather these are cinematic signifiers of the ongoing transformation of/in the identity question of Bangladeshis/Bengalis in today's transnational world order.

Reference

Murshid, Tazeen M. (1997). 'State, Nation, Identity: The Quest for Legitimacy in Bangladesh', *South Asia*. 20.2.

Roy, Asim (1983). *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*. Dhaka: Academic Publishers.

Raju, Zakir Hossain (2007). 'Madrasa and Muslim Identity on Screen: Nation, Islam and Bangladeshi Art Cinema in Global Stage'. In Malik, Jamal (ed) *Madrasas in South Asia: Teaching Terror*?. London: Routledge.

Ahmed, Rafiuddin (2001). 'Introduction—The Emergence of the Bengal Muslims', *Understanding the Bengal Muslims*. Rafiuddin Ahmed (ed.). Dhaka: University Press Ltd.

Zakir Hossain Raju: Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences, Independent University, Bangladesh.

মিডিয়ার কাছে মানুষ কী চায়

মীর মাসরুর জামান

‘দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে’
–জেলখানার চিঠি: নাজিম হিকমত

মিডিয়াকে কীভাবে দেখে সাধারণ মানুষ? কিংবা মিডিয়ার কাছে মানুষ কী চায়? প্রযুক্তির উৎকর্ষে বৈচিত্র্যে ভরে-ওঠা মিডিয়া জগৎ আর মিডিয়ার এমন দ্রুত বেড়ে চলা-সময়ে যদি একটু থামি এসব প্রশ্নের মুখোমুখি?

তাহলে মানুষের কিছু কথা শুনি আগে।

‘আমার যদি একটা ক্যামেরাঅলা মোবাইল থাকতো’

কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ড় অঞ্চলের এক নারী। তাঁর নাম আলেয়া বেগম। মাঝবয়েসী এ নারীর সঙ্গে দেখা কিছুদিন আগে। কুড়িগ্রামেই গবেষণা ধরনের কাজ করতে গিয়ে। কথা বলতে বলতে আলেয়া বেগম বলছিলেন তাঁর জীবনের এক ঘটনার কথা।

আলেয়া বেগমের এলাকার এক দরিদ্র নারী বয়স্কভাতার কার্ড পাওয়ার জন্য ইউনয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বারের কাছে গেলে মেম্বার অবৈধভাবে এক হাজার টাকা দাবি করেন। ওই নারী আলেয়া বেগমকে এ ঘটনা জানান। মেম্বারকে হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনা নিয়ে আলেয়া ওই নারীকে টাকাটা দেয়ার বুদ্ধি দেন। ওই নারী যখন টাকা দিতে মেম্বারের কাছে যান তখন কাছেই লুকিয়ে থাকেন আলেয়া বেগম। মেম্বার টাকা নেয়ার সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে তাকে ধরে ফেলেন তিনি। মেম্বারকে বলেন, ‘তোমারে গরিব মানুষ ভোট দিয়ে মেম্বার বানাইছে তাদের রক্ত চুষে খাওয়ার জন্য নয় বরং তাদের সাহায্য করার জন্য। তুমি যদি এই কাজ দ্বিতীয়বার কর আমি বেবাক মানুষের সামনে ফাঁস করে দেব তোমার এই দুর্নীতির কথা।’ মেম্বার বয়স্কভাতায় ওই নারীর তালিকাভুক্তি নিশ্চিত করেন।

খুবই উত্তেজনা নিয়ে এই ঘটনা তুলে ধরে আলেয়া বেগম বলেন, 'আমার যদি একটা ক্যামেরাঅলা মোবাইল থাকতো তাইলে দুর্নীতির এই সব ছবি তুলে মিডিয়ায় দিয়ে দিতাম। তখন মানুষই বিচার করত এসব অপরাধীদের।'

আলেয়া বেগম বলেছেন, 'মিডিয়াতে দিয়ে দিতাম', ক্লাস নাইন পর্যন্ড় পড়া এই নারী বলেননি 'পত্রিকায় দিয়ে দিতাম' কিংবা 'টেলিভিশনে দিয়ে দিতাম'। তাহলে নিজে ছবি তুলে তিনি দিয়ে দিতে পারেন, তেমন ভরসা নিয়ে কোন ধরনের মিডিয়ার কথা তিনি ভাবেন? অনলাইন বা ভার্চুয়াল সাংবাদিকতা কিংবা সিটিজেন জার্নালিজমের মতো বিষয়েরও ধারণা সময়ই অস্পষ্ট করে হলেও তাকে দিয়ে দিয়েছে? নাকি সংবাদপত্র বা রেডিও-টেলিভিশনের মতো মিডিয়াকেই তিনি এমন চোখে দেখেন যেখানে তার মতো মানুষেরও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে? অথবা মানুষ যেখানে বঞ্চনা কিংবা প্রতারণার শিকার হয়, সেখানে প্রয়োজনে লুকিয়ে ছবি তুলে তা প্রচার করাকেই জর"রি মনে করেন কাঠামোবদ্ধ পেশাগত নৈকিতকতার বাইরে?

'আমরা গরিব বইলা আমাদের সন্ড়ানের খবর কেউ দেখায় না'

কয়েকদিন আগে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ বুলেটিনে একটি রিপোর্ট প্রচার হলো। বিষয় মুক্তিপণের দাবিতে একটি পরিবারের শিশু সন্ড়ান অপরহরণ। সেই রিপোর্টে দেখা গেলো শিশুটির মা বলছেন, 'আমরা গরিব কিন্তু আমাদের বাচ্চারে অপহরণ কইরা মুক্তিপণ চায়, এত টাকা আমরা পামু কই? আমরা গরিব বইলাই আমদের সন্ড়ানের খবরও কেউ দেখায় না!'

এই 'খবর দেখানো'র আকুতির মধ্য দিয়ে কী আশা করেন এই মা? তার মাথায় কি তখন সূত্র হিসেবে কাজ করে? কিছুদিন আগে কেরাণীগঞ্জে ব্যবসায়ীর শিশু সন্ড়ান পরাগের অপহরণ ঘটনার কথা, যা নিয়ে প্রায় সব মিডিয়ায় কয়েকদিন ধরে বড় বড় রিপোর্ট হয়েছে এবং পরে উদ্ধারও করা গেছে শিশুটিকে? তার কি তবে আর সব কিছুর বাইরে বড় ভরসার জায়গা মিডিয়া, যেখানে খবর এলেই জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি মেলে?

মানুষ মানে কেমন মানুষ, চাওয়াটাই বা কেমন

যখন বলি মানুষ মিডিয়ার কাছে কী চায়? কিংবা মানুষ কীভাবে মিডিয়াকে দেখে? তখন কোন ধরনের মানুষের কথা ভাবি? মানুষ মানে সব ধরনের মানুষ: ১. আমাদের এই পিরামিড কাঠামোর সমাজে পিরামিডের চূড়ায় যাদের অবস্থান সেই অবস্থাপন্ন এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের মানুষ, ২. মাঝামাঝিতে যাদের অবস্থান সেই 'মধ্যবিত্ত' 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' গোষ্ঠী এবং ৩. পিরামিডের একেবারে নিচে সবচেয়ে বিস্ড়ৃত অংশে যারা, সেই

বেশির ভাগ মানুষ, যারা গরিব, যারা বঞ্চিত যারা গ্রামে কিংবা শহরের বস্ড়ি অথবা ফুটপাতে থাকে।

তবে এখানে মানুষ বলতে পিরামিডের একেবারের নিচের অংশের মানুষকেই ভাবা হচ্ছে, যাদের আবার মোটা দাগে দুই অবস্থায় দেখা যায় – ক. সাধারণভাবে সব সময় দুর্দশাগ্রস্থ, খ. সরাসরি কোনো নিপীড়ন, নির্যাতন অথবা বঞ্চনার শিকার। ওপরে দুটো ঘটনার মধ্যে প্রথমটিতে আলেয়া বেগম সাধারণভাবে দুর্দশাগ্রস্ড় অবস্থার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন আর পরেরটিতে অপহরণের শিকার শিশুটির মা সরাসরি এক বর্বরতার শিকার।

এই দুই অবস্থার মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে যদি মিডিয়ার কাছে তাদের চাওয়ার কথা ভাবি তাহলে তাদের প্রতি মিডিয়ার দায়িত্বের কথাও আলোচনায় আসে। আলোচনায় আসে দ্র"ত আর বহুমাত্রিকতায় বিকাশমান এই সময়ে মিডিয়া কীভাবে সেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে, সেই প্রসঙ্গও।

যখন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ড় কোনো মানুষের কথা মিডিয়া তুলে ধরে তখন কিছু সুফল যে সেই মানুষরা পান, তেমন দৃষ্টান্ড় আমরা দেখি। আর প্রচলিত 'সংবাদমূল্যে'র কারণেও তেমন ঘটনার প্রচার ও প্রকাশ হয়ে থাকে। তবে এই ঘটনাভিত্তিক সাংবাদিকতার বাইরে মিডিয়ার ভূমিকাকে যদি ইস্যুভিত্তিক জায়গায় দেখা হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই একজন-দু'জন মানুষের তাৎক্ষণিক 'উপকারে'র বাইরে এমন এক পরিবর্তন আনতে পারে যা কখনো কখনো বদলে দিতে পারে বিদ্যমান কোনো নীতি কাঠামো, যার মধ্য দিয়ে খুলে যেতে পারে প্রায় স্থায়ী কিংবা অনেক মজবুত কোনো সমাধানের পথ। যেমন, নির্যাতনের শিকার কোনো শিশুর খবর তুলে ধরে সেই ঘটনায় অপরাধীদের শস্ড়ির আওতায় আনার দৃষ্টান্ড় আমরা দেখি। আবার বিষয়টিকে একটি ঘটনা হিসেবে না দেখে সামাজিক রোগ হিসেবে দেখলে আর সিস্টেমের মধ্যে থাকা সমস্যাকে এ অবস্থা চলতে থাকার কারণ হিসেবে দেখলে তা নিয়ে মিডিয়ার ভূমিকা হয় অন্য রকম – ঘটনাভিত্তিক না হয়ে হয় ইস্যুভিত্তিক। আর তখন সাংবাদিকতা ঘটনা ঘটার পরের সাংবাদিকতা না হয়ে হয় ঘটনা ঘটানোর কিংবা আর না ঘটানোর সাংবাদিকতা। এবার ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়া অ্যাডভোকেসি কিংবা অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতার কথা ভাবা যাক।

মিডিয়া অ্যাডভোকেসি ও সাংবাদিকতা

গণমাধ্যম যখন জনস্বার্থে নীতি প্রণয়ন, বাস্ড়বায়ন বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় (আন্দোলন) যুক্ত হয় এবং লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ড় প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়, তখন তা আখ্যায়িত হয় মিডিয়া অ্যাডভোকেসি নামে। লক্ষ্য অর্জন মানে, গণমানুষের স্বার্থে

সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক নীতি সংস্কার, নীতি প্রণয়ন, বাস্ড়বায়ন ইত্যাদি। সহজ কথায়, সামাজিক ইস্যুতে গণমাধ্যমের আন্দোলনতুল্য কর্মকা ই মিডিয়া অ্যাডভোকেসি। মিডিয়া অ্যাডভোকেসিকে দেখা হয় প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে।

যেহেতু মিডিয়ার জগতটি বিশাল, তাই মিডিয়া অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রটিও নিঃসন্দেহে ব্যাপক। কেননা সাংবাদিক, শিল্পী, লেখক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকারসহ বিচিত্র পেশাজীবী গোষ্ঠী মিডিয়া সেক্টরের অংশ। আর এসব গোষ্ঠী এবং তাদের সামগ্রিক কর্মকা ই মিডিয়া অ্যাডভোকেসির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু তাই নয়, সাধারণ সমাজের অন্য সকল সেক্টরের অংশগ্রহণও এতে জর"রি। কারণ সমাজের সকল সেক্টরের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো আন্দোলন চূড়ান্ড় লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। অংশগ্রহণের মাত্রার ওপরই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে।

মিডিয়ার অংশটুকুই আলোচনা করা যাক। আর মিডিয়ার বেলায় অন্য সকল অংশের বদলে এ পর্যায়ে সাংবাদিকতাকে ঘিরে থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেননা মিডিয়া সেক্টরের মধ্যে সাংবাদিকতাই সবচাইতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আজ পর্যন্ড় স্বীকৃত।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিডিয়া অ্যাডভোকেসির ধারা বা কৌশল

অ্যাডভোকেসির অন্যান্য ধারার মতোই মিডিয়া অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রেও প্রথম কাজটি হচ্ছে সামাজিক প্রয়োজন, সমসাময়িকতা এবং গণচাহিদার ভিত্তিতে ইস্যু নির্বাচন করে নেয়া। তারপর প্রচারের ধাপ।

লন্ডন টাইমস্ এর সম্পাদক ডি লেইন বহুকাল আগেই বলেছিলেন, 'Newspaper lives on discolors'. এই ফাঁস করে দেয়ার ব্যাপারটিই মিডিয়ার যেমন প্রথম কাজ, মিডিয়া অ্যাডভোকেসিরও প্রাথমিক ধাপ। এর মধ্য দিয়েই সংবাদপত্রসহ মিডিয়া পরিবর্তন বা পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলোর দিকে সূচনাপর্বের আলোকপাতটি করে, যাকে বলা চলে 'breaking the silence'. এবং যে কোনও ইস্যু বা সুপ্ত সমস্যার ব্যাপারে বড় আন্দোলনে যাওয়ার আগে এই 'breaking the silence'ই প্রধান কাজ। এটিই অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনে বিষয়টি প্রবেশ করানোর প্রাথমিক কৌশল হিসেবে কাজ করে। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ার পর ঊষর জমিতে লাঙল চালানো কিংবা বীজ বোনার আগে যেমন মাটিকে ভিজিয়ে নিতে হয় ভালো করে।

তারপরের কাজটি – ইস্যুভিত্তিক আরো গভীরতম রিপোর্টিং। এইসব রিপোর্টে থাকতে পারে ইস্যুভিত্তিক দিকনির্দেশনাও। এবং এগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী একসঙ্গে একাধিক কাগজ এবং অন্যান্য মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে পারে। সংবাদপত্রের

'exclusiveness'-এর ক্ষেত্রে এতে হয়তো সমস্যা হবে। কিন্তু জনস্বার্থের বিচারে বিষয়টি গুর"ত্বপূর্ণ এবং কার্যকর। কারণ তাহলে সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি হবে বেশি। গভীর রিপোর্টিং-এর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হয় তথ্যানুসন্ধান, ফলো-আপ রিপোর্টিং, ফিচার, জনমত জরিপ আর্টিকেল, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ইত্যাদি। প্রকাশ করা যেতে পারে ক্রোড়পত্র, পত্রিকার ইস্যুভিত্তিক সংখ্যা।

এ পর্যায়ে ইস্যুটি সামাজিক এজেন্ডায় পরিণত হয়। সম্পন্ন হয় সামাজিক আলোড়ন ও জনমত সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি। আর ইস্যু চিহ্নিত করার সময় বিবেনায় রাখা জর"রি, ইস্যুটিকে হতে হবে – একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়; নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনযোগ্য; নীতি নির্ধারণী দিক নির্দেশনাসম্পন্ন এবং জনগোষ্ঠী/কম্যুনিটির জীবনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী।

ইস্যুভিত্তিক রিপোর্টিংসহ ধারাবাহিক গণমাধ্যম তৎপরতার ফলে এজেন্ডায় পরিণত হওয়ার পর বিষয়টি যুক্ত হয় আনুষঙ্গিক সামাজিক কর্মকা ের সঙ্গে।

অধিকার, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম

মিডিয়ার উদ্ভব-পর্ব এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণার পীঠস্থান ফ্রান্স ও ফরাসি বিপ বের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখি, ব্যক্তি বিকাশের এবং অধিকারের সর্বোত্তম সনদপত্র-১৭৮৯ সালের 'মানুষের অধিকার'। এই অধিকারনামায় ১৭টি প্রয়োজন উলে খ করা হয়। প্রথম অধিকারটিতেই বলা হয়েছে, 'জন্মাবধি ও সারাজীবন সব মানুষই সর্বোচ্চ স্বাধীন এবং তার অধিকার সমান।' মানুষের মতামত প্রকাশের যথার্থতা এবং উপযুক্ততাকে সর্বোচ্চ স্থানে ঠাঁই দিয়ে ওই সনদের এগারো ধারায় বলা হয়েছে, 'চিন্ড়ার ও মতের অবাধ লেনদেন হলো মানুষের সর্বচে' মূল্যবান অধিকারের অঙ্গ। সুতরাং যেকোনও নাগরিক স্বাধীনভাবে (সব কথা) বলতে, লিখতে, ছাপতে পারবে।'

তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, সংবাদপত্র তথা মিডিয়াকে জনগণের মুখপত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রকে জনগণের মুখপত্র হয়ে উঠতেই হয়। কারণ গণমাধ্যমের কাজই তো – মানুষকে জানানো; মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং মানুষের পক্ষে প্রহরী (ওয়াচডগ) হিসেবে কাজ করা। আর গণমাধ্যমের মতো প্রহরী যদি সজাগ ও সোচ্চার না থাকে, তাহলে সমাজে অনাচার, অসঙ্গতিগুলো নির্বিঘ্নেই ঘটতে থাকবে।

ভবিষ্যৎ আছে

অনেক প্রশ্নবোধক দিয়ে এই অসম্পূর্ণ লেখাটির পর আরো প্রশ্ন থাকে – কর্পোরেট মালিকানায় ছেয়ে যাওয়া প্রচলিত মিডিয়া কোন স্বার্থে সামাজিক পিরামিডের নিচের

অংশের মানুষ নিয়ে এত কিছু করতে যাবে? মিডিয়ার পাঠক-দর্শক-শ্রোতা হিসেবে তারা কতোখানি? কিংবা মিডিয়ার বাণিজ্যের যে নিয়ামক সেই স্পন্সর-গোষ্ঠীর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তারা?

এমন প্রশ্ন নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আপাতত আমরা আবারো একবার আলেয়া বেগমের কথা মনে করি, যিনি বলেন, 'আমার যদি একটা ক্যামেরাঅলা মোবাইল থাকতো!' – এটি নিশ্চয়ই কিছুর ইঙ্গিত দেয়, আর সেই ভাষা যদি প্রচলিত গণমাধ্যম বুঝতে না পারে তাহলে ভবিষ্যৎ আছে, যা খুব দূরে নয় ... আর যেখানে অপেক্ষা করছে মিডিয়া কিংবা সাংবাদিকতার নতুন সংজ্ঞা, আজ আমরা যার কেবল ছিটেফোঁটা দেখতে পাচ্ছি।

তথ্যসূত্র

কল্লতর সেনগুপ্ত। *সংবাদ ও সাংবাদিকতা*। কলকাতা: গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কামরুল হাসান মঞ্জু। এডভোকেসী বা সিভিক জার্নালিজম। ঢাকা: ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

গৌরাঙ্গ নন্দী। সংবাদপত্র জনগনের মুখপত্র, *নিরীক্ষা*। সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

মীর মাসরুর জামান। সমাজ বদলে মুক্ত সাংবাদিকতার ভূমিকা, *প্রান্তজন*। ঢাকা: ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

মীর মাসরুর জামান: বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই; পরিচালক, গণমধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'সমষ্টি'।
ইমেইল: masrurzaman@yahoo.com.

Connecting theories to practice: Humanitarian Communication

Mubashar Hasan

A dominant scholarly debate revolves around the issue of relevance of theories into real life. Being a doctoral researcher in a school of Government and International Relations, I have encountered several high profile international symposiums where politicians blamed academics for coining in theories seemingly little relevant to practical life and public policies. Such allegations, however, go other way as academics blames politicians for formulating policies with little relevance to academic analyses. In order to bridge this disjuncture between theory and practice, presently, many academic journals form various disciplines are being published under the title of "Theory and Practice." A Major aims behind publication of these peer-reviewed academic journals are two folds: a) to promote a more cutting edge scholarly debate with practical solution to problem(s) and b) to obliterate or at least address critics who argue academics live in a fantasy world.

More or less, every discipline in social science has relevance to this debate. The gravity of this problem of disconnection between theory and practice however varies discipline to discipline. Nevertheless, a universal presumption is based on a perception that argues a theory is always contested and thus it could always be proven unreal. The intention of this writing, however, is not to engage into the debate of disjuncture between theory and practice. Rather, there are three objectives of this article. First, I want to underpin how I applied theoretical frameworks, gathered through my 4 years of academic training at the department of Mass Communication and Journalism (MCJ), Dhaka University (DU) into

real life situation(s) in order to save lives and livelihoods. In other words, I want to share my experience about application of meaningful interaction between theory and practice in the field of humanitarian communication. Second, I want to emphasize the global dimension of the job of a local humanitarian communication officer. Finally, as an alumnus, I want to suggest that the MCJ department of Dhaka University could emphasize on crafting graduates, who will specially be prepared to take challenges of a humanitarian communicator. In this regard, my motif is to enthuse current students about considering their career prospect in humanitarian communication.

What is Humanitarian Communication?

Without engaging into theoretical debates, it is suffice to state that humanitarian communication is majorly used by international organizations (IO) and non-government organizations (NGOs) in order to raise awareness about a crisis situation through strategic use of various communication tools and media. Sometimes governments too use humanitarian communication even though it is becoming a rare practice. The dimension of such communication work can be multifaceted and complex depending upon the size and nature of the organization. The success of this communication work, however, is always difficult to measure. Nevertheless, globally, international organization such as United Nation's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), humanitarian NGOs such as Oxfam, Action Aid, Save the Children, emphasized on humanitarian communication and invest thousands of dollars in creative use of media and communication. As an implication, when cyclone Aila struck the southwest part of Bangladesh on May 25,2009 on the following day a British reader of the Guardian newspaper could see the devastation and havoc created by cyclone through photographs and news while sipping in their morning coffee. In other words, due to the extraordinary power of globalization, humanitarian communicators turned a local disaster into a global one. As a result, stakes for the affected people receiving assistance from all possible quarters are increasing. The MCJ department of the DU, through its

undergraduate course prepares a student to take up the challenging role of a humanitarian communicator. This job enables a student to connect theories of agenda setting, news reporting, sub editing, development communication, photography, digital communication, interpersonal communication, videography, researching, public relation and gender and communication, to practice. In following section I want to share my learning gained from my deployment as the media and communication coordinator of Oxfam for little over 20 months. As I said before, the main intention is to allure current students to seriously consider humanitarian communication as future career move.

From Classrooms of MCJ to Crisis Zones

My first exposure to real hardship of people was in March 2010 when I had to visit Gabura, an island in Satkhira district. I saw how hard it was for a mother to arrange few drops of drinking water for her babies. The hardship of a father to earn the bread for their family was hard to overlook. Elderlies, sick and old, were somehow passing days on makeshift shanties, built up on the broken parts of embankments. More than 3 million Bangladeshis were affected when Cyclone Aila swept across the Bay of Bengal and ravaged its southern coast in 2009, killing nearly 200 people. Cyclone Aila saw high tides break through poorly maintained coastal embankments built in the 1960s, submerging people's houses and livestock. The government had promised to rebuild the embankments, and donor agencies also promised to help. However, a year about 4,00,000 people were forced to living on the broken parts of embankments in small makeshift shelters built with leaves, bamboos and woods without electricity or proper beds. Bed for many was the sandy embankment. Bureaucratic affairs and corruption in the agency responsible for rebuilding the broken embankments delayed reconstruction work.

I had traveled in a small boat with a group of journalists to the village 'number nine shora' in Satkhira district, in southern Bangladesh and it was as though we were entering an entirely different world. The village, once was protected by embankment,

was under water. We saw groups of men and women with young kids in rickety boats were flocking towards a pond where Oxfam had introduced pond sand filter (PSF) technology. This technology helps to significantly improve the quality of highly contaminated surface water of the pond. It is the only source of fresh water in ten Kilometre area and people had traveled there for at least an hour and half in small wooden boats for water as most of the ponds in this area are full of saline water.

The village had lost hope. I heard some of them praying to God to take them away from this world so they didn't have to suffer any more. I broke out into a sweat. It wasn't just because of the heat but because of the sheer reality of unreal things.

Children were wandering about without shoes or proper clothes. Men and women were forced to live under the open skies, simply hoping that God could look after them. Once they had a house to live in, lands to cultivate crop. Now, they had nothing. All their belongings were lost in the cyclone. "Pray for me please, I don't have any belongings apart from the skin of my body", said 55 year old Muhammad Abdul Kader. His eyes were dull and lifeless. After hearing his words, I felt stunned. What I was seeing felt almost unreal. I was shivering under hot sun.

I had recently returned home to Bangladesh, after spending about three and a half years living in Europe, where I had been studying after completing BSS in MCJ from DU. My life in the West was so different: it was another world. I had the luxury of debating political theories with other students at Dundee University, exploring the theological interpretation of life with Sufis and spiritual figures; debating about globalization, multiculturalism and evolution theory at the Al Maktoum Institute of Aberdeen University, playing badminton with artists, students and professors, cycling around the UK and Netherlands, attending concerts, attending plays, sightseeing and living a carefree life.

But there I was standing on a broken embankment surrounded by helpless and hungry people who lost everything. I was excited to get a job with Oxfam. However never realized it could be so emotionally challenging. I felt personally obliged to do something for this group

of people but didn't know what to do. Later, I thought real hard and realized that the MCJ department equipped me with theoretical knowledge of using many tools, which can be of use to these people. All I needed was creativity in using those tools.

That was the start. After successfully convincing my boss, I was able to develop a media and communication strategy for a joint platform of over 10 international NGOs working in Aila affected areas and felt the Government required to pressurize its responsible agency in order to rehabilitate those people. We felt that the media forgot these people who live couple of hundred miles away from the capital. To take the stories of these forgotten people through media and web 2 technologies to the people and policy makers, I applied: agenda setting theories, rules of 5w 1H in all public relation documents, with simple application of rules of third in photography, simple videography techniques to generate footage. Performing artists, journalists, local civil society organizations as well as many policy makers alongside with masses came forward. Through Facebook, local and international media, this campaign was able to make the miseries of Aila affected people a national issue on May 2010. Perhaps as an implication of vigorous media campaign, Honorable Prime Minister visited Aila affected area after a year of the cyclone struck. That news made me jubilant. What I require to mention especially here is that in that campaign, many journalists, especially alumnus of MCJ department, enthusiastically participated. With their participation, under my editorship we published a milestone publication titled, "Testimony of Journalist on the swelled sufferings of the Aila Affected People." Even a foreign journalist, Nicolas Haque of Al Jazeera participated in that publication which is a rare case. Mr. Manjurul Ahsan Bulbul, CEO of Boishakhi Television, unveiled that publication in the National Press Club. All writers wrote voluntarily and expressed their frustration over the slow movement of embankment reconstruction. The point I wanted to make is that through careful agenda setting and employing clear messaging in all official communication materials, it was possible even to break the rigid box of 'objectivity' of journalists. They themselves became campaigners for human crisis. The nobleness in

humanitarian communication is thus distinct and spiritually rewarding. I was emotionally challenged in many more cases in my short span of time. However, amid those, my experience of covering Pakistan's worst flood in its history as a media officer in 2010 was worth mentioning. Specially, at that period, my understanding of humanitarian communication was challenged by the emergency situation. For example, I had to work as a newsgatherer, photographer, and spokesperson to media, blogger and public relation officer. Many areas of Swat in Pakistan were devastated due to flood. Mainstream international media like BBC News was not been able to know what was happening on the ground. I came up with an idea of interviewing an Oxfam employee who was on the ground over telephone and write his account in my journalistic language. The BBC website was happy to find a witness on the ground and start publishing a special page as Aid worker's diary in its website. I had to work as some sort of news reporter for Bangladeshi media at that time as no Bangladeshi journalist was in Pakistan to cover Pakistan's flood, which was dominating headlines of major international news channel. Even though I was nervous to start with as I had no formal training of a broadcast journalist, I managed to report for BBC Bangla, Channel I and ATN news for few times. Furthermore, I had to give live interview to Sky News, Bloomberg TV, several BBC radio channels and even to Vatican radio. The deployment was only for three weeks but the pressure was demanding. I was nervous but Arefin sir's advice in the class "communicate your message clearly with your audience" and "5w 1 H of reporting" helped me to successfully deal with the challenges. I had to further work as a photographer in that assignment where I had to travel in the province Khaiber Pakthunkwa and pulled out a photo story of my choice. I conducted a photo story on how children's were coping with floods. BBC News website hosted my photo story and the feelings was extra ordinary. The reason was not only that my work was appreciated by one of world's most influential media but also the satisfaction that I could at least do something within my mean for the people living in crisis. Giti Ara Nasreen madam's advice in classroom and outside classroom where she always

emphasized on upholding people's dignity was helped me in my presentation of people living in the distress.

What is the Point of All?

The major point behind sharing real life experience is to depict how theoretical knowledge if applied creatively could unleash endless potential for the graduates of the MCJ. The satisfaction, in the case of humanitarian communication is beyond explanation. Very few jobs in the world in fact enable us to do something for the people in distress. In the context of humanitarian communication the wonderful interaction of theory and practice made each campaign successful. Embankments in Aila affected areas were rebuilt under supervision of military. The job nature of humanitarian communicators demands expertise in almost all major modules taught at the MCJ. There should be little debate that a nexus of market and education exists behind the philosophy of university education especially if one considers job prospects for university graduates. In my observation, most of our graduates start dreaming to be a successful journalist from their student years. Some ended up joining the civil service while some other migrates or engage in business after leaving the campus. Very few pursue higher education. While there is nothing wrong in such career moves, I feel there needs to be some sort of push from the department in terms of making students aware of the job industry in humanitarian communication. The boundary of such job has no limits, and the reward in terms of monetary gain is competitive where perhaps the job satisfaction is extra ordinary. Perhaps with some serious planning, the MCJ department could take initiative in establishing a formal link with the humanitarian organizations. Under this link graduates of MCJ could perform internship and gain work experience. Furthermore, the department perhaps could consider developing specific course in

Humanitarian communication and offer specialized masters course with industry support. The demand is there for sure.

Mubashar Hasan: PhD candidate at the School of Government and International Relations, Griffith University, Australia.

একটি সাধারণ কৃতজ্ঞতা পত্র

রেজানুর রহমান

ক.

তিনি আপন মনে লিখেই চলেছেন। তাঁর টেবিলের ওপর ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট কাগজের স্তূপ। একপাশে চায়ের কাপ। কয়েকটা বই। তাঁর কাছে বারবার ফোন আসছে। লেখা না থামিয়েই বিশেষ কায়দায় বামকানে রিসিভার রেখে গম্ভীর হয়ে কথা বলছেন। একবার কাকে যেন ধমক দিলেন – আপনার কোনো অজুহাত আমি শুনব না। ঐ রিপোর্টটা আমি আজকেই চাই। কী বললাম বুঝেছেন? বলেই শব্দ করে রিসিভার রাখলেন। তাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। মনের ভেতর ভয় ঢুকেছে। এই লোকের যা মেজাজ। আমার সাথে হয়তো কথাও বলবেন না। তাহলে আমার চাকরির কী হবে? অনেক আশা নিয়ে এসেছি। জীবনে পণ করেছি সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোনো পেশায় যাবো না। বিসিএস পরীক্ষা দেইনি। আমার বাবা ধরেই নিয়েছিলেন বিসিএস পরীক্ষা দিলে আমি পাস করতাম। বাবার ধারণা ভুল ছিল না। আমরা পাঁচ বন্ধু (বাবা যাদেরকে চিনতেন) একসাথে বিসিএস পরীক্ষার ফরম ফিলআপ করেছি। পরীক্ষার প্রবেশপত্রও এসেছে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছি। হঠাৎ একদিন মনে হলো – এ আমি কী করতে যাচ্ছি? বিসিএস-এ সুযোগ পেলে তো ঢাকায় থাকা হবে না। আমার গল্প-উপন্যাস লেখালেখির কী হবে? জীবনে একটাই ইচ্ছে সাংবাদিক হবো। বিসিএস-এ তো সেই সুযোগ থাকবে না। বিসিএস বিষয়ক পড়াশোনার গতি কমিয়ে দিলাম। পরীক্ষা শুরুর আগের দিন সৈয়দপুর থেকে বাবার চিঠি পেলাম। চিঠিতে অনেক পরামর্শ। বাবা ভালো করে পরীক্ষা দিও। তোমার ওপর আমাদের অনেক আশা। পরীক্ষার দিন আমি ইচ্ছে করেই ঘুমের ভান করে থাকলাম। সবাই জানল ঘুম থেকে উঠতে পারিনি বলে পরীক্ষার হলে বসতে পারিনি। এটা কী কোনো যুক্তির কথা হলো! এই ধরনের বোকামি কেউ করে?

যা হোক, ইচ্ছে করে এই বোকামিটা করার পর থেকে একটা অপরাধবোধ আমাকে সর্বদাই তাড়া করে ফিরছিল। বাবা আমার কর্মকাণ্ডে খুশি নন সেটা বুঝতে পারছি। কারণ বন্ধুরা সবাই বিসিএস-এ চান্স পেয়েছে। কাজেই আমিও পরীক্ষা দিলে চান্স পেতাম, এটাই বাবার ধারণা। কিন্তু আমার মন বলছিল ঠিক রাস্তায় হাঁটছি। আমি

সাংবাদিক হবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশোনা করছি। এটাই তো আমার সঠিক পথ। তখনকার দিনে দৈনিক পত্রিকা মানেই ইত্তেফাক। আমি সেই পত্রিকায় এসেছি চাকরি খুঁজতে। কিন্তু এখানে যে আমার চাকরি হবে তার তো কোনোই লক্ষণ দেখছি না। মনের ভেতর জেদ চাপল। দেখি না শেষ পর্যন্ড় পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? একটা লোক কতক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারেন? এটা কি কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে? আপনার টেবিলের সামনে কেউ বসে আছে। অথচ আপনি তাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। কথা না বলতে চাইলে তাকে তো সেটা জানিয়ে দিবেন। বলবেন আজ আমি ব্যস্ড়। অন্যদিন আসেন...।

আমি যখন এসব কথা ভাবছি তখনই আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, ইত্তেফাকের তৎকালীন চিফ রিপোর্টার নাজীমউদ্দিন মোস্ড়ান। গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন – চা খাবেন? আমি ভয়ে অস্থির। নাজীমউদ্দিন মোস্ড়ান আমার সাথে কথা বলেছেন এটাই যথেষ্ট। চা খাওয়ার কথা বলে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মাথা নেড়ে না-সূচক ভঙ্গি করতেই আমাকে মৃদু ধমক দিলেন – বলেন কী? সাংবাদিকতা করবেন অথচ চা খাবেন না? কী করেন?

তাঁর প্রশ্ন শুনে ভয়ে ভয়ে বললাম – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ছি, সেকেন্ড ইয়ার...

আমার কথা কেড়ে নিলেন নাজীমউদ্দিন মোস্ড়ান। মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন – আপনি সাংবাদিকতা বিভাগে পড়েন? গুড! ভেরি গুড!

এরপরের গল্পটা অনেক ছোট। কিন্তু এই ছোট গল্পটাই আমার জীবনের মোড় পাল্টে দিল। দেশের শ্রেষ্ঠতম দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকে 'বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার' হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলাম। যার টেবিলের সামনে বসে নেতিবাচক অনেক কথা ভাবছিলাম সেই নাজীমউদ্দিন মোস্ড়ান আমার জীবনের ইতিবাচক অনেক ঘটনার প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন।

খ.

আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি দুটো কারণে। এক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া। দুই, কাঙ্ক্ষিত বিষয় সাংবাদিকতায় পড়তে পারা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া মানেই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজের মতো করে গড়ে নেবার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন কোনো ছাত্রছাত্রী যদি তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুর“ থেকেই একটা র“টিন অনুসরণ করে – অর্থাৎ ৪/৫ বছরে পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি মেধা বিকাশের পথে এটা করবে, ওটা করবে এরকম নির্ধারিত র“টিন ফলো করে তাহলে আমি নিশ্চিত বলে

দিতে পারি চাকরির জন্য তাকে হা-পিত্যেশ করতে হবে না। চাকরির পেছনে তাকে ছুটতে হবে না। চাকরিই তার পিছনে ছুটবে।

একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমি দৈনিক ইত্তেফাকের তর“ণকণ্ঠ বিভাগে একটা ফিচার লিখেছিলাম। শিরোনাম ছিল 'স্বপ্ন দেখার সাহস চাই'। ফিচারটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বর্ষ থেকেই স্বাবলম্বী হবার পথে হাঁটার একটা পথ বলে দেয়া হয়েছিল। ধরা যাক প্রথম বর্ষের ১০ বন্ধু (বিভিন্ন বিভাগের হতে পারে) সিদ্ধান্ড় নিল তারা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে জমাবে। ১০ বন্ধুর প্রতি মাসের জমা ৫ হাজার টাকা। যৌথভাবে এই টাকা যদি প্রতি মাসে কোনো ব্যাংকে জমা হতে থাকে তাহলে ৫ বছরে মূল টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ লাখ। লভ্যাংশসহ টাকার পরিমাণ আরো বড় হবে। এই টাকার সাথে বুদ্ধি যোগ করলেই আরো বড় কিছু করা সম্ভব। ইত্তেফাকের এই ফিচার পড়ে অনেকেই দলগত প্রক্রিয়ায় টাকা জমিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে দলগতভাবে আজ স্বাবলম্বী হয়েছে।

মেধা বিকাশের নানা ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বেশি। শুধু প্রয়োজন এরকম পরিকল্পনা অনুযায়ী পথ চলা।

গ.

তবে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুব যে একটা গোছানো ছিল তা নয়। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ই আমার জীবনের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলো পার হয়েছে যেখানে সেই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতি। আমার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ যেমন একটি শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান তেমনই একটি বড় পরিবারও। যার মূল ভিত্তি মায়া আর মমতা। আমরা অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম মাত্র ১৫ জন। মাস্টার্সে এসে আমাদের সহপাঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় বোধকরি ২৭। সকলে যেমন ছিলাম সহপাঠী, বন্ধু তেমনি ছিলাম ভাইবোনের মতো। আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ বিভাগের অফিসার-কর্মচারী সকলে।

ঘ.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েই আমার মনে হয়েছিল – হ্যাঁ, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। এই ধারণা আরো পোক্ত হয়েছিল বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেখে। শিক্ষকই যে যথার্থ অভিভাবক সেটা আবার বুঝলাম সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়ে। আমাদের সময়ে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন নূরউদ্দিন স্যার। আমার শিক্ষাজীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তিনি। সাখাওয়াত আলী খান ও গোলাম রহমান স্যারের মধ্যে আমার শিক্ষক পিতার ছায়া পেয়েছিলাম। আরো দুজনের

কথা বলতেই হবে। আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ও মরহুম সিতারা পারভীন। তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন অনার্সে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। জন্ডিস রোগে আক্রান্ড় হবার কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বেডে ঠাঁই মিলেছে। জন্ডিস জটিল আকার ধারণ করেছিল। একনাগাড়ে ২৭ দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছে। একদিনের ঘটনা। বিকাল বেলা। হাসপাতালের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে দেখি একজন ভদ্রলোক আমার মাথার দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই তিনি না না করে উঠলেন। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এও কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। প্রিয় শিক্ষক এসেছেন ছাত্রকে দেখতে। তিনি আর কেউ নন আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী। আমাদের প্রিয় আহাদ স্যার। অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলাম – স্যার আপনি? কতক্ষণ হলো এসেছেন?

স্যার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মৃদুস্বরে বললেন – বেশি না ৩০/৩৫ মিনিট হবে?

স্যারের কথা শুনে আমি নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এও কি সম্ভব?

৩০ মিনিট ধরে অসুস্থ ছাত্রের শিয়রের পাশে বসে আছেন শিক্ষক। মনে হলো বাবা বসে আছেন আমার পাশে।

স্যারকে বললাম – আমাকে ডাকলেই তো...

স্যার আগের মতোই নিচুস্বরে বললেন – তুমি যেভাবে ঘুমাচ্ছিলে তাতে মনে হচ্ছিল তোমার ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক হবে না। তাই...

স্যারের মুখে আরো যা শুনলাম তা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, বিস্ময়করও বটে। স্যারের প্রিয়তমা স্ত্রী আমাদের আরেক প্রিয় শিক্ষক সিতারা পারভীনও এসেছেন হাসপাতালে। তিনি ছিলেন সন্ড়ানসম্ভবা। তাই তাকে হাসপাতালের ভেতরে আনেননি স্যার। সিতারা ম্যাডাম হাসপাতালের বাইরে গাড়ির ভেতর একা বসে আছেন।

কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে গিয়েছিল সেদিন। একজন ছাত্রের জন্য এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? আমি অহংকারের সাথে একথা বলতে পারি – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিভাগ আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগ হলো গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। এখানে ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে একটা পরিবারের মতোই জীবন কাটায়। যে জীবন বড়ই আনন্দের। সাফল্যের তো বটেই।

ঙ.

সাফল্যের কথা যখন উঠল তখন অহংকারের সাথেই বলি কথাটা। আজ বাংলাদেশে এই যে সাংবাদিকতার এত জোয়ার এত সাফল্য তার পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অবদান অনেক। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিওসহ প্রচার

মাধ্যমের সকল শাখায় আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। যুগের প্রয়োজনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সাংবাদিকতা বিভাগ চালু হয়েছে। সেখানেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরাই।

চ.

আমার সাংবাদিকতা জীবনের মূল শেকড় প্রোথিত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেই। একথা সত্য, সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির সুযোগ না পেলে হয়তো আমি আজকের রেজানুর রহমান হতে পারতাম না। এজন্য আজীবন কৃতজ্ঞ আমার প্রিয় বিভাগের প্রতি। সেই সাথে আমার কয়েকজন সহপাঠীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করার সময় থেকেই আমি ইত্তেফাকের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসেবে সাংবাদিকতা জীবন শুর“ করি। ইত্তেফাকে ছিলাম টানা ১৯ বছর। তারপর ইমপ্রেস টেলিফিল্ম-এর বিনোদন পাক্ষিক আনন্দ আলোর সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হই। এজন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগরের প্রতি। সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশোনা করার সময় আমার কয়েকজন বন্ধু বিশেষ করে কুররাতুল তাহমিনা মিতি, আসাদুল ইসলাম এবং আইনী ইলিয়াসের কাছে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আমাদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ অশান্ড় ছিল। ছাত্র সংঘর্ষ লেগেই থাকত। তাই প্রতিদিন সংবাদের পেছনে ছুটতে হতো। ক্লাস মিস হয়ে যেত মাঝেমধ্যে। মিতি ও আসাদ আমার এই ঘাটতি পূরণ করেছে। এখনো সেই স্মৃতি মনে পড়ে – মিতি আর আসাদ আমাকে ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দিত প্রিয় শিক্ষকের মতোই। অশেষ কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি।

ছ.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ৫০ বছরে পা দিয়েছে। হ্যাঁ, সেটা দেশের রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র অফিসে গেলে সহজেই বোঝা যায়। যেখানে যাই সেখানেই সাংবাদিকতা বিভাগের আলো জ্বলতে দেখি। ৫০ বছরে অনেক আলো জ্বালিয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় সাংবাদিকতা বিভাগ। এক সময় এমন কথাও শোনা যায় সাংবাদিকতা করতে গেলে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু আমি বুঝেছি কেন সাংবাদিকতা বিভাগে পড়া উচিত। বর্তমান সময়ে সাংবাদিকতা বিভাগের গুর“ত্ব আরো বেড়েছে। কারণ এখন সাংবাদিকতায় ভালো করতে গেলে

বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনাটাও জরুরি। আশা করি আমাদের প্রিয় সাংবাদিকতা বিভাগ এজন্য আরো বেশি প্রস্তুত।

রেজানুর রহমান: কথাসাহিত্যিক; নাট্যকার-পরিচালক; সম্পাদক, *আনন্দ আলো*।

সাহসী সাংবাদিকদের গল্প

সুজন মেহেদী

ভূমিকা

সাংবাদিকতার ইতিহাস আসলে সাহসিকতার ইতিহাস। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বিশ্বের সব প্রান্তেই সাংবাদিকদের ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। এরমধ্যে এমন কিছু সাংবাদিক আছেন যারা তাদের কর্মনিষ্ঠা, সততা ও সাহসিকতার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমার এই লেখায় আমি গত একশ বছরের মধ্যে জন্ম নেয়া এমন কয়েকজন সাংবাদিকের জীবন ও কর্ম তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বব উডওয়ার্ড

গত একশ বছরে সাংবাদিকতার জগতে যে বড় কয়েকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছে তার একটি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি। ১৯৭২ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর যে দুজন রিপোর্টার এই রহস্য উন্মোচন করেন তাদের একজন বব উডওয়ার্ড।

১৯৪৩ সালের ২৬ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম রবার্ট উপসার এডওয়ার্ড। বাবা ছিলেন অঙ্গরাজ্যের প্রধান বিচারপতি। ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্যে লেখাপড়ার পর মার্কিন নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন বব। ১৯৭০ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১ সালে সামরিক চাকরি ছেড়ে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ রিপোর্টার হওয়ার আবেদন করেন। সাংবাদিকতার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কর্তৃপক্ষ তাকে একটি ডিগ্রি নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বব রিপোর্টার হিসেবে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ নিয়োগ পান।

১৯৭২ সালের ১৭ জুন সকালে ওয়াশিংটন ডিসির ডেমোক্র্যাট দলের সদর দপ্তর ওয়াটার গেট অফিস থেকে পাঁচ জনকে আটক করা হয়। বব ও আরেক রিপোর্টার কার্ল বার্নস্টেইনকে দায়িত্ব দেয়া হয় এরা কারা, তারা কী করছিল তা খুঁজে বের করার জন্য। বব ও কার্ল অনুসন্ধান শুরু করেন এবং খুঁজে পান যে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন-ই তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন রিপাবলিকানদের অফিসের তথ্য জানার জন্য। তাদের কাজ ছিল টেলিফোনে আড়ি পেতে প্রতিপক্ষের কৌশল জেনে নেয়া। বব ও কার্ল 'অল দ্যা প্রেসিডেন্টস মেন' নামে ধারাবাহিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেন। এতে সারাবিশ্বে এমন তোলপাড় ওঠে যে মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্ড়

াব আনা হয় এবং ১৯৭৪ সালে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

১৯৭৩ সালে বব কার্লের সাথে যৌথভাবে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। জীবনে তিনি এমন অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন। তার জীবনের আরেক সাহসী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ২০০১ সালে 'সেপ্টেম্বর ইলেভেন অ্যাটক'।

বব বর্তমানে লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ড়। *অল দ্যা প্রেসিডেন্টস মেন* ছাড়াও *বুশ অ্যাট ওয়ার*, *প ্যান অব অ্যাটাক*, *স্টেট অব দানিয়েল*, *এ সিক্রেট হোয়াইট হাউজ স্টোরি* তার বিখ্যাত কয়েকটি বই। তার সম্পর্কে কার্ল বলেছেন, উডওয়ার্ড নিজেকে আমাদের সময়ের সেরা রিপোর্টার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হয়তো তিনিই বিশ্বের সর্বকালের সেরা রিপোর্টার।

হান্ট ডিঙ্ক

হান্ট ডিঙ্ক ছিলেন তুরস্কের সংবাদপত্র *আগস্*-এর প্রধান সম্পাদক। পাশাপাশি তিনি কলামিস্ট হিসেবে ও সংখ্যালঘু আর্মেনিয়ানদের প্রতিনিধি হিসেবে তুরস্কের রাজনৈতিক জগতে পরিচিত এক নাম।

১৯৫৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তুরস্কের মাল্টায়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন হান্ট। ১৯৬০ সালে তার পরিবার ইস্ড়াম্বুলে চলে আসে। এরপর ইস্ড়াম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যায় লেখাপড়া করেন এবং সেসময় নিষিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দল টিককোর সদস্য হন। লেখাপড়া শেষ করে হান্ট সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন কিন্তু টিককোর সাথে একসময় জড়িত থাকার দায়ে কমিশন বঞ্চিত করা হয়। হান্ট চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৮০ সালে জেনারেল কেনান এভরান সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে, তার পুরো পরিবার বিপদে পড়ে। এসময় হান্ট ও তার বাবা জাল পাসপোর্ট তৈরি করে পালানোর সময় ধরা পড়েন। তুর্কি বিরোধী সংগঠন 'আসালা গেরিলা'রা প্যারিসে তুর্কি রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করলে সরকার হান্ট ও তার বাবাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৬ সালে হান্ট সাপ্তাহিক *আগস্* বের করেন। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি আর্মেনিয় জনগোষ্ঠীর ওপর তুর্কি জেনারেলদের নিপীড়ন, গণহত্যা ও সমস্যার কথা তুলে ধরতেন। পাশাপাশি তিনি অন্যান্য জাতীয় দৈনিক *জামান* ও *বিরগান*-এ কলাম লিখতেন।

২০০৭ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুর ১২টার দিকে *আগস্* অফিসের কাছে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ২৫-৩০ বছরের এক যুবক প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গেছে, ওই যুবক আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চাইলে হান্ট তাকে প্রত্যাখান করেন।

এই মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে ওগান সামাস্ট নামে এক যুবককে ২২ বছর

কারাদ ের আদেশ দেয় ইস্ড়াম্বুলের আদালত।

জ্যোতির্ময় দে

ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণকারী এই সাংবাদিক শহরটির অপরাধের শিকড় তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। অপরাধের অন্ধকার জগতকে জ্যোতির্ময় যতটা আলোর মুখে এনেছিলেন, আর কারো পক্ষে এতটা সম্ভব হয়নি। তাকে বলা হত 'ফাদার অব ক্রাইম রির্পোটিং'।

১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতির্ময়। লেখাপড়া শেষ করে প্রথম জীবনে চাকরি নেন বন বিভাগে। ফটোগ্রাফি ছিল তার নেশা। মুম্বাইয়ের কাছে বড়িভালি সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্কে চাকরি করার সময় বন্যপ্রাণী অপরাধের সাথে জড়িতদের চিনতে থাকেন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে চিঠি লিখে কাজ না হওয়ায় ছবিসহ প্রমাণ যুক্ত করে লিখতে থাকেন সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে। এতে কাজ হলেও চাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। ১৯৯৬ সালে চাকরি ছেড়ে *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* সংবাদপত্রে অপরাধ বিটের রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুর করেন। অপরাধের প্রাণকেন্দ্র মুম্বাই শহরের অপরাধীদের মুখোশ খুলে যেতে থাকে তার একের পর এক প্রতিবেদনে। এমনকি ডনখ্যাত দাউদ ইব্রাহিম ও ছোটা রাজন বাহিনীর সাম্রাজ্যও ধ্বংসের মুখে পড়ে। ফলে মৃত্যু হুমকি জ্যোর্তিময় এর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

২০০৫ সালে তিনি প্রভাবশালী সংবাদপত্র *হিন্দুস্ড়ান টাইমস*-এ যোগ দেন। তবে বনিবনা না হওয়ায় ওই বছরই তিনি *মিড ডে* নামে একটি ট্যাবলয়েড দৈনিকের অপরাধ ও অনুসন্ধানী সংবাদ বিভাগের সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

২০১১ সালের ১১ জুন বিকাল তিনটার দিকে মোটর সাইকেলে যাবার পথে হিরানন্দরি পার্কের কাছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা তাকে গুলি করে। সাথে সাথে হিরানন্দরি হাসপাতালে নেয়া হয়। তবে তাকে বাঁচানো যায়নি।

এ ঘটনায় প্রথমে পুলিশ ও পরে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ড় ব্যুরো (সিবিআই) তদন্ড় করে। এতে জানা যায়, ছমাস আগে মাফিয়ারা নাসিক এলাকায় যশোবন্ড় নামে এক সরকারি কর্মকর্তাকে হত্যা করে। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে জ্বালানি তেল সিন্ডিকেটের খোঁজ পান জ্যোর্তিময়, যে কর্মকা ের সাথে ছোটা রাজন এবং তার মাস্টারমাইন্ড দাউদ ইব্রাহিমের ভাই ইকবাল কাসকার জড়িত। পরে এ হত্যার সাথে একজন সাংবাদিকের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। মামলাটি এখনো চলছে।

আনা পলিটকোভস্কি

আনা পলিটকোভস্কি আমেরিকায় জন্ম নেয়া ইউক্রেন বংশোদ্ভূত রাশিয়ান সাংবাদিক ও লেখক। চেচেন স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে লেখা ও সেখানকার নির্যাতনের চিহ্ন তুলে ধরার

অপরাধে ২০০৬ সালের ৭ অক্টোবর পুতিন সরকার গোপনে মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে তাকে গুলি করে হত্যা করে। এখনো এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ড় করা হয়নি।

আনা পলিটকোভস্কি প্রথম আলোচনায় আসেন ১৯৯১ সালে চেচনিয়া বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর। যেখানে চেচেনদের পক্ষ নেয়াকে রাশিয়ার গণমাধ্যমে দেশদ্রোহী ও গোপন মুসলমানিত্ব বলে মনে করা হয়, সেখানে পলিটকোভস্কি প্রথম চেচনিয়া নির্যাতন সম্পর্কে বিশ্বকে জানান দেন।

১৯৫৮ সালে আনা নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার কূটনীতিক। ১৯৮০ সালে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি সাংবাদিকতায় স্নাতক হন। এরপর টিভি রিপোর্টার হিসেবে টিভি চ্যানেল *ভল্যাদিস্ ।ভ লিস্ড়িয়েভ*-এ যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে তিনি *লাজভেস্ড়িয়া* সংবাদপত্রের রিপোর্টিং বিভাগে যুক্ত হন। এরপর একে একে *অবচ্চায়া গেজেট* ও *নভয়া গেজেট*-এ চাকরি করেন।

১৯৯১ সাল থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বিশেষ করে দুর্নীতি এবং পুলিশ ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকা- নিয়ে সরব হন। সরাসরি চেচেন অভিযানের সমালোচনা করে লেখালেখি শুর- করেন। সেখানে বিদ্রোহের নামে মুসলিমদের ধরপাকড়, নির্যাতন, অপহরণ ও হত্যার বির-দ্ধে প্রথমবারের মতো রাশিয়ান সংবাদপত্রে প্রশাসনকে দায়ী করেন এবং প্রমাণ দিতে থাকেন।

২০০১ সালে আনাকে সামরিক কর্মকর্তারা চেচনিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে গ্রেফতার করেন। তিনি তখন চেচনিয়ার পরিবার অদৃশ্য হওয়ার বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য অনুসন্ধান করছিলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ পান সামরিক কর্মকর্তারা যাকে খুশি ধরে বন্দি শিবিরে ধরে নিয়ে যায়, যারা রড দিয়ে পেটায়, ইলেকট্রিক শক দেয় – শুধু নারী নয় এমনকি যেখানে পুর-ষদেরও ধর্ষণ করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর আনার ওপরও নির্যাতন করা হয়। পিটিয়ে সারা শরীরে কালসিটে দাগ বানানো হয়। মাঝে মাঝে বস্ত্র খুলে নেয়া হতো। এরপর উপহাসমূলক বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ড় করা হয়। এ ঘটনার পর মস্কোর কোনো সংবাদপত্র আর চেচনিয়ায় সাংবাদিক পাঠানোর ঝুঁকি নেয়নি।

ইউরোপে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সরকার আনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তবে নানাভাবে বিদেশে পালিয়ে যাবার হুমকি দেয়া হতো তাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগকরিকত্ব নেয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা না করে রাশিয়ার অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকেই উপযুক্ত মনে করতেন।

২০০৬ সালের ৭ অক্টোবর তালাবদ্ধ ফ্ল্যাটে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার বুকে দুটি গুলি করা হয়েছিল। এরপর আনার বিচার নিয়ে সরকার নানা নাটক শুর- করে। তবে এ ঘটনা রহস্যই থেকে গেছে।

লাসান্থা বিক্রমাতুঙ্গে

লাসান্থা মানিলাল বিক্রমাতুঙ্গে ছিলেন শ্রীলংকার জাতীয় ইংরেজি দৈনিক *সানডে লিডার*-এর সম্পাদক। একইসাথে *টাইম* ম্যাগাজিনের রিপোর্টার ও টিভি শো গুড মর্নিং এর উপস্থাপক ছিলেন।

১৯৫৮ সালের ৫ এপ্রিল লাসান্থা কলম্বোয় জন্মগ্রহণ করেন। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি নিয়ে আইন পেশায় জীবন শুর- করেন লাসান্থা। পাশাপাশি কলম্বোয় *আইল্যান্ড* ও *সান* পত্রিকায় সাংবাদিকতায় জড়িত হন। ১৯৭২ সালে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি এবং দেশটির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

১৯৯৪ সালে তিনি নিজে *সানডে লিডার* সংবাদপত্র চালু করেন। সম্পাদক হলেও মাঝে মাঝে নিজেই বেরিয়ে পড়তেন খবরের খোঁজে। একইসাথে সরকার ও তৎকালীন তামিল টাইগারদের কর্মকা-ের সমালোচনা করতে থাকেন তিনি। মাত্র একবছরেই পত্রিকাটি সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্রে পরিণত হয় এবং সেইসাথে তার জীবনের ওপর হামলাও আসতে থাকে।

২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গের সরকার তার নামে অপরাধ মামলা দেয়। কিন্তু তা প্রমাণিত হয়নি। লাগাতার জীবনের হুমকি আসতে থাকায় ২০০২ সালে তার প্রথম স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যান। ২০০৮ সালে মাহিন্দ্রা রাজা পাকসে ক্ষমতায় আসেন, এবং তিনিও লাসান্থার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জনসমক্ষেই রাজা পাকসে লাসান্থাকে 'সন্ত্রাসী সাংবাদিক' উপাধি দেন। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গৌতব্য রাজাপাকসে অস্ত্রচুক্তি নিয়ে এক প্রতিবেদনের দায়ে মানহানির মামলা করেন তার বির-দ্ধে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে *সানডে লিডার*-এ তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিল 'যদি তুমি লেখ, তোমাকে হত্যা করা হবে'।

২০০৯ সালের ৮ জানুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় অফিসে যাওয়ার পথে চার মোটরসাইকেল আরোহী লাসান্থাকে গুলি করে। পরে তাকে কলম্বো ন্যাশনাল হাসপাতালে নেয়া হয় এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা যান।

বিরোধীদল এ ঘটনার জন্য সরকারকে দায়ী করে। তবে অভিযোগ আছে এ ঘটনার কোনো সুষ্ঠু তদন্ড় হয়নি। মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে তিনি সোনালি সামারাসিঙ্গেকে বিয়ে করেন। হত্যাকা-ের পর সোনালি শ্রীলংকা থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।

ভেরোনিকা গুইরেন

যেসব সাংবাদিকদের জীবন দিয়ে হলিউডে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তাদের একজন হলেন ভেরোনিকা গুইরেন। আইরিশ এই সাংবাদিক অপরাধ বিষয়ক সংবাদ সংবাদ কাভার

করতেন।

ভেরোনিকার জন্ম ১৯৫৮ সালের ৫ জুলাই, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে। আইরিশ জাতীয় মহিলা দলের হয়ে কিছুদিন বাস্কেটবল ও ফুটবল খেলেছেন। ১৯৮৩ সালে বিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন তিনি এবং জনসংযোগ পেশায় জড়িয়ে পড়েন। পেশাগত কারণে সাংবাদিকদের সাথে কাজ করতে হয়েছে তাকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে পেশা বদল করে ১৯৯০ সালে *সানডে বিজনেস পোস্ট*-এ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে তিনি যোগ দেন আয়ারল্যান্ডের জনপ্রিয় সংবাদপত্র *সানডে ইনডিপেনডেন্ট*-এ। এ সময় তিনি নানা ধরনের পেশাদার অপরাধীদের মুখোশ তুলে ধরেন তার প্রতিবেদনে। সেখানে প্রথমবারের মতো উঠে আসে অপরাধীদের সাথে আইরিশ পুলিশ ও রিপাবলিকান আর্মির সখ্যর কথা।

আইরিক মাদক সম্রাট বলে পরিচিত জন গিলিগ্যানের শিষ্য জন ট্রেইনরের কর্মকা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর অনবরত মেরে ফেলার হুমকি পেতে থাকেন ভেরোনিকা।

১৯৯৬ সালের ২৬ জুন এক ট্রাফিক সিগনালে গিলিগ্যানের ভাড়াটে গুারা ছয়টি গুলি করে ভোরোনিকার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়।

১৯৯৮ সালের নভেম্বরে এই মামলার রায় হয়। এতে জিলিগ্যানের চার শিষ্যকে যাবজ্জীবন কারাদ দেয় আইরিশ আদালত। ভেরোনিকার জীবন নিয়ে ২০০৩ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জোয়েল সুমাখার ছবি নির্মাণ করেন। তার সম্মানে ডাবলিন পার্কে একটি আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে।

ড্যানিয়েল পার্ল

যেসব সাংবাদিক পেশার জন্য জীবন দিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও নৃসংশ হত্যাকার শিকার হন ড্যানিয়েন পার্ল। ড্যানিয়েল পার্ল সহকর্মীদের কাছে ড্যানি নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন।

১৯৬৩ সালে ১০ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির প্রিন্সটনে জন্মগ্রহণ করেন ড্যানিয়েল জ্যাকব পার্ল। ইহুদি বংশোদ্ভূত পার্ল ১৯৮৫ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি *নর্থ এডামস ট্রান্সক্রিপ্ট*, *বার্কশায়ার ঈগল*, ম্যাসাচুসেটস ও সান ফ্রানসিসকো *বিজনেস টাইমস*-এ কাজ করেন।

১৯৯০ সালে তিনি *ওয়াল স্টিট জার্নাল*-এর আটলান্টা অফিসে নিয়োগ পান। এপর একই পত্রিকার ওয়াশিংটন অফিসে ১৯৯৩ সালে ও লন্ডন অফিসে ১৯৯৬ সালে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি বসনিয়ায় গণহত্যার ওপর প্রতিবেদন করেন। ২০০১ সাল থেকে পত্রিকাটির দক্ষিণ এশিয়া প্রধান হিসেবে ভারতের মুম্বাইয়ে চলে আসেন। সেখান থেকে

আল-কায়েদাকে অনুসরণের জন্য পাকিস্ড়ানের অন্যতম ধর্মীয় নেতা শেখ মুবারক আলি গিলানির সাক্ষাৎকার নিতে ২০০২ সালের ২৩ জানুয়ারিতে ড্যানি পাকিস্ড়ানের করাচিতে আসেন। সেখান থেকে একটি জঙ্গী গ্রুপ তাকে অপহরণ করে ই-মেইলে মুক্তিপণ দাবি করে। তবে *ওয়াল স্টিট জার্নাল* বা তার স্ত্রী সাড়া দেননি। এরপর তালেবান জঙ্গীরা তাকে অমানুষিক নির্যাতনের পর ছুরি দিয়ে গলা কেটে মাথা আলাদা করে ফেলে এবং পুরো ঘটনাটি ভিডিও করে। ২০০২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জঙ্গীরা ভিডিও গণমাধ্যমের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

২০০২ সালের জুলাই মাসে আহমেদ ওমর সাঈদ শেখ নামে একজন পাকিস্ড়ানি-ব্রিটিশকে এই হত্যার দায়ে পাকিস্ড়ানের আদালত মৃত্যুদ দেয়। অবশ্য ২০০৭ সালে গুয়ান্ড়ানামো বে কারাগারে এক বিচারে আল কায়েদা নেতা খালিদ শেখ মোহাম্মদ স্বীকার করেন তিনি নিজে ড্যানিয়েলের শিরচ্ছেদ করেন। ফলে পাকিস্ড়ানের আদালতের ওই বিচার নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে।

ডেভিড রোড

বর্তমান বিশ্বের এক অনন্য সাহসী এক রিপোর্টারের নাম ডেভিড স্টিফেন রোড। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ৪৫ বছর বয়সী এই সাংবাদিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনে এখনো সারা পৃথিবী চষে বেড়ান।

ডেভিডের জন্ম ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেইনল্যান্ডে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নেবার পর তিনি আর পেছনে তাকাননি। ১৯৯০ সালে যোগ দেশ *এবিসি নিউজ*-এর ওয়ার্ল্ড সার্ভিস-এ। ১৯৯৪ সালে *ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটর*-এ যোগ দেয়ার পর তাকে ক্রোয়েশিয়া পাঠানো হয় সার্ব-বসনিয়া যুদ্ধ কাভার করার জন্য। এসময় তিনি *দ্যা গার্ডিয়ান*-এর হয়েও কাজ করতে থাকেন। ডেভিড প্রথম সাংবাদিক হিসেবে মুসলিম জনগোষ্ঠীতে নিশ্চিহ্ন করার সার্ব পরিকল্পনার প্রমাণ বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন। সেখানকার যুদ্ধের কারণ ও গণহত্যা পরিকল্পনায় জড়িত ব্যক্তিদের কর্মকা তুলে ধরেন সবিস্ড়ারে।

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে ডেভিড *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ যোগ দেন এবং বলকান যুদ্ধের পুরোটা সময় সার্বিয়ান ধ্বংসযজ্ঞ তুলে ধরেন। ইরাক দখলের পর কিছুদিন সেখানেও কাজ করেন তিনি। আবু গারিব কারাগার ও ইরাক জুড়ে মার্কিন বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন তুলে আনার কৃতিত্বও ডেভিডের। ২০০২ সালে তাকে দক্ষিণ এশিয়া ব্যুরোর সহকারি প্রধান হিসেবে দিলি তে পাঠানো হয়। এসময় তিনি পাকিস্ড়ান, আফগানিস্ড়ান তালেবান ও আল-কায়েদা নিয়ে একের পর প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। ২০০৮ সালে তাকে তালেবানরা অপহরণ করে। ডেভিডের নিরাপত্তা নিয়ে দরকষাকষি চলতে থাকায়

ঘটনাটি *নিউইয়র্ক টাইমস* ব াক আউট করে। সাতমাস পর তিনি মুক্তি পান। এরপর থেকে তিনি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাঈদ সালেম শাহজাদ

জঙ্গী বিক্ষুব্ধ পাকিস্ড়ানে স্বাভাবিকভাবেই সাঈদ সালেম শাহজাদের সাংবাদিকতার বিষয় ছিল জঙ্গীবাদ, তালেবান ও আল-কায়েদা। আর এটাই তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ায়।

পাকিস্ড়ানের করাচিতে বসবাসকারী অনুসন্ধানী সাংবাদিক ছিলেন সাঈদ সালেম শাহজাদ। ১৯৭০ সালে এই শহরেই জন্মগ্রহন করেন তিনি। পরে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্ড়র্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

সাঈদ হংকং ভিত্তিক *এশিয়া টাইমস* অনলাইনের পাকিস্ড়ান ব্যুরো প্রধান ছিলেন। এছাড়া একাধারে পাকিস্ড়ানের *ডন*, ফ্রান্সের *লা মঁদ*, ইতালির *লা স্ড়াম্পায়* লিখতেন। হর হামেশায় চলে যেতেন তালেবান অধ্যুষিত এলাকায়। তুলে আনতেন নানা অজানা কথা। তালেবানকে পকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর সহায়তার কথা তিনি লিখেছেন তার বই *ইনসাইড আল কায়েদা এন্ড তালিবান: বিয়ন্ড বিন লাদেন এন্ড নাইন ইলেভেন*-এ। আর এভাবেই তিনি পাকিস্ড়ানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন।

আগে থেকেই তালেবানরা একের পর এক হুমকি দিয়ে আসছিল শাহজাদকে। ২০১০ সালে সহকর্মী সাংবাদিক আবদুল গনি বারাদারকে আইএসআই আটক করলে এর প্রতিবাদে স্পর্শকাতর প্রবন্ধ লেখেন শাহজাদ। এবার হুমকি দিতে থাকে আইএসআই। নিরাপত্তা চেয়ে আন্ড়র্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে শাহজাদ এক চিঠি লেখেন, সেখানে তিনি আশঙ্কা করেন আইএসআই তাকে হত্যা করতে পারে।

২৯ মে ২০১১। সন্ধ্যা ছটায় একটি টিভি টক শোতে অংশ নেয়ার কথা ছিল শাহজাদের। ৫:৪২ মিনিট থেকে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরদিন করাচীর ১৫০ মাইল দূরের মান্দি বাহাউদ্দিন জেলার একটি খালের পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় পাকিস্ড়ানের সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ড় কমিটি গঠন করে। তবে ৪ জুলাই ২০১১ *নিউইয়র্ক টাইমস* এক প্রতিবেদনে জানায়, ওবামা প্রশাসনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে যে এই হত্যার ঘটনায় আইএসআই জড়িত। যদিও আইএসআই কড়াভাবে তাদের সংশি ষ্টতা নাকচ করে আসছে।

তথ্যসুত্র

আইপিআই, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স, কমিটেড টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য।

সুজন মেহেদী: সিনিয়র করেসপনডেন্ট, *ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন*, ঢাকা

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের সফট নিউজ

আল আমিন খান

সময়টা ঠিক মনে নেই। তারিখটাও না। সম্ভবত চলতি বছরের ১০ জানুয়ারির এদিক ওদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি টিএসসির দিকে। এক বন্ধু পেছন থেকে ডাকল: 'কিরে তোর কোন খবর নেই, ফোন দিয়েও পাচ্ছি না, কী হয়েছে তোর,' ইত্যাদি ইত্যাদি...। দ্রুতগতির হাঁটাতে এই ডাক কিছুটা বাঁধ সাধলেও একেবারে রুদ্ধ করতে পারেনি। গতি কমিয়ে বলে গেলাম, সামনে বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। এখন ব্যস্ত, ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠান শেষে কথা হবে।... হাঁটার গতি বাড়িয়ে চলে গেলাম টিএসসি চত্বরে। উদ্দেশ্য উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খোঁজখবর নেওয়া।

১৯৬২ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে যুক্ত হয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। সেদিক থেকে ২০১২ সালের ২ আগস্ট তারিখে বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি হয়ে গেছে। এতদিন পর আবার কিসের আয়োজন? সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণটি পড়েছিল রমজান মাসে। আর তাই শুধু আনন্দ র‍্যালি আর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সুবর্ণজয়ন্তী পালন। কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি বলে কথা! এত ছোট্ট আয়োজনকে আর যাই বলা যাক, উদ্‌যাপন কি বলা যাবে?

তাই সুবর্ণজয়ন্তীকে নানা বর্ণে বর্ণিল করে রাখতে, স্মরণীয় করে রাখতে সবার সে কি ভাবনা! বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক আখতার সুলতানা, শিক্ষক ফাহমিদুল হক, শাওন্তী হায়দার, সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, সাইফুল হক আর সাবেক শিক্ষার্থী নাঈমুল ইসলাম খান ছিলেন অগ্রগামী। তাদের নাম না নিলে ধৃষ্টতাই দেখানো হবে। অন্যান্য শিক্ষক আর অ্যালামনির অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা দিনের পর দিন দিনকে রাত আর রাতকে দিন করেছে কাজেকর্মে, ভাবনাচিন্তায় তাদের নাম করে শেষ করা যাবে না। মাস্টার্সের মাহবুবুল হক ভূইয়া তাদের অন্যতম। অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতির সময়জুড়ে তার দৌড় দেখেনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকরই হবে।

সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটে ইংরেজি নতুন বছরের সূচনালগ্নেই। উৎসবের দিন ধার্য করা হয় ২১, ২২ আর ২৩ জানুয়ারি। আয়োজন তিনদিনের। কিন্তু প্রস্তুতির কাজটা তো আর দু চার দিনে হয় না! তাই জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। কী হবে, কেমন করে হবে, কোথায় হবে, ইত্যাকার বিষয়ে পরিকল্পনা।

কথায় আছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। আর আমরা বলি, যেমন প্রস্তুতি তেমন পারফরমেন্স। আর তাই দ্রুত প্রাথমিক পরিকল্পনা সেরেই পুরোদমে নেমে পড়তে হলো মাঠে।

যেকোন বড় আয়োজনে অর্থের প্রশ্নটাই সবার আগে চলে আসে সামনে। অর্থের সংস্থান হলো তো কাজ অর্ধেকটাই হয়ে গেল। বিভাগের শিক্ষক ও সাবেক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু অর্থ যোগানের মিশন। টানা ১০ দিনের হাড়ভাঙা খাটুনিতে সাড়াও মিললো বেশ। একদিকে অর্থ যোগানের জন্য বিভাগের কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী দৌড়াচ্ছেন ব্যাংকপাড়া থেকে বাণিজ্যএলাকা, এ অফিস থেকে ও অফিস। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নিখুঁত করতে টিএসসির আঙিনায় সকাল সন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে অনুশীলন করছে দেবদাস-পার্বতী-চন্দ্রমুখী, ডিম ও মুরগিবাদী জাতীয় নেতৃদ্বয়, সুশীল সমাজ, আমাদের বিভাগেরই আবিষ্কার ভয়েস সফটওয়্যারের বুদ্ধিমান রোবটবৃন্দ আর আলিফ লায়লার দৈত্য-দানবরা। সুরেলা গান আর নাচের শৈলী প্রদর্শনে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে কেউ কেউ।

দুই দিনের চলচ্চিত্র উৎসব আর তিনদিনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। তৃতীয় দিন নবীনবরণ ও অগ্রায়ণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণা, টকশো, বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি জনপ্রিয় ব্যান্ডদল সোলসের মনমাতানো গান, সবশেষে দৃষ্টিনন্দন আতশবাজির ঝলকানি ইত্যাদির কোনকিছুই বাদ দেওয়া যাবে না তালিকা থেকে। আর তাই আয়োজনের ধকলটাও ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় খানিক বেশি। টিএসসি মিলনায়তনের এই আয়োজনের বাইরেও থেকে যায় আরো কত কী! নাস্তা আর মজাদার খাবার ছাড়া উৎসবের ষোলকলা পূর্ণ হয় কী করে? তাই এদিকটাতেও দৃষ্টি রাখতে হয়েছে সর্বদা। পুরো টিএসসি জুড়ে চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জা তো থাকতেই হবে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উদ্বোধন করলেন তিনদিনের মহাযজ্ঞ। ২১ ও ২২ জানুয়ারির আয়োজন সফল হলো প্রত্যাশিতভাবেই। কিন্তু সবার যত ভাবনা এই আয়োজনের মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ ২৩ তারিখের অনুষ্ঠান নিয়ে। কোন ধরনের ঘাটতি থেকে যাবে না তো? সময়ের আবর্তে চাপ কমে এসেছে কিছুটা। যদিও পুরো মুক্তি মেলেনি অনুষ্ঠানের শেষ অবধি। নির্ঘুম কাটল আগের রাতটা। সকাল থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত থাকতে হলো অনেককেই। তবে আয়োজন করার ফাঁকে-ফোকরে অনুষ্ঠান উপভোগের কাজটা চালিয়ে নেওয়ার পারদর্শিতা প্রদর্শনে আমরা একটুও বেরসিক ছিলাম না এদিন।

সকাল ১১টায় অতিথিরা মঞ্চে উঠলেন। বাইরের কেউ নয়। বিভাগেরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন ছিলেন প্রধান অতিথি। বিশেষ অতিথির আসনেও আরেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রথম পর্বের বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হয় না কখনোই। বরাবরের মতো এবারও সাফল্যের তক্‌মা নিয়ে একে একে শেষ হলো নবীনবরণ ও অগ্রায়ন, পুরস্কার বিতরণ আর আলোচনা পর্ব।

১২টা বাজার পর ১৫ মিনিটের বিরতি। সবাইকে টিএসসি ক্যাফেটারিয়াতে গিয়ে ভাঁপা পিঠা খাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো। অনুষ্ঠানের অতিথি থেকে শুরু করে সবাই একে একে বের হচ্ছিলেন। সকাল পেরিয়ে তখন ভরদুপুর। বাঘ পালানো মাঘের শীতের সেই দুপুরটাও গরম গরম ভাঁপা পিঠা খাওয়ার জন্য একেবারে কম লোভনীয় ছিল না। কিন্তু মিলনায়তনের ফটক পেরিয়ে সবাই শুধু মাঠের দিকেই যাচ্ছেন। ভুলে গেছেন ভাঁপা পিঠার কথা! কী হচ্ছিল মাঠে?

ও ও ও... কাউকে না বলে কয়ে মাঠে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে ফ্ল্যাশ মব। বিভাগের ৬ষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা আর পরিবেশনায় এক ব্যতিক্রমী আয়োজন। গানের তালে তালে নৃত্য সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের চমক শুরু এখান থেকেই।

পিঠাযজ্ঞের পরই শুরু 'বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর' শীর্ষক টকশো। প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসা, বিভাগের শিক্ষক ড. সাখাওয়াত আলী খান, ড. গোলাম রহমান আর *আমাদের অর্থনীতি* পত্রিকার সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানের ক্ষুরধার আলোচনায় মুগ্ধ হয় সবাই। আলোচনা শেষ। সবার চোখে মুখে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ। এই ক্লান্তি দূর না করতে পারলে বাকি চমকগুলো চমকাতে পারবে না দর্শকদের। এল ভুরিভোজের বিরতি। ভোজের পর ভূঁড়ি পূর্ণ! সরবে আবারো মিলনায়তনে সবার যাত্রা। বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণা আর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় আন্দোলিত হলো বর্তমান শিক্ষার্থীরা। এরপর শুরু হলো বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে আগুনের পরশমনি ছন্দের তালে তালে নৃত্যের পরিবেশনা অপলক দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কবিতা, গান আর নৃত্যের সমারোহ উদ্বেলিত করে নবীন প্রবীণ আর বর্তমানের সমারোহকে। রিয়েলিটি শো, টকশো ইত্যাদির মাধ্যমে ফুটে ওঠে বর্তমান সমাজের নানা খুঁটিনাটি। বাংলা চলচ্চিত্রের পাঁচ দশকের ইতিহাসকে উপজীব্য করে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং সিনে লিগেসি নামক সেগমেন্টের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের ঘুরিয়ে আনে চলচ্চিত্রের সেকাল থেকে একালে। বাংলা উপন্যাসের কালজয়ী কিছু চরিত্র নিয়ে পরিবেশিত হয় ফ্যাশন শো। ৪র্থ ব্যাচের ভয়েস সফটওয়্যার নামের একটি কমেডি পরিবেশনা পেটে খিল ধরিয়ে দেয় সবাইকে। এই খিল খুলতে না খুলতেই আসে পরবর্তী আয়োজন। শিক্ষার্থীদের পরিবেশনার শেষ দিকে থাকে আলিফ লায়লা এবং লাভ ফর হাফ সেঞ্চুরি নামের হাস্যরসে টইটম্বুর বাংলা চলচ্চিত্র।

বিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। তাই মনে হয় প্রতিটি পরিবেশনার ক্ষেত্রেই ছিলো পঞ্চাশের একটি অঘোষিত ছাপ। সিনে লিগেসি, ফ্যাশন শো, চলচ্চিত্র সুবর্ণ করে

দিয়েছে পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে।

সুবর্ণজয়ন্ড়ীকে ভিন্ন মাত্রা দিতে মঞ্চ কাঁপিয়েছেন জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী পার্থ বড়ুয়া এবং তার দল সোলস। শেষ হইয়াও যেন হইল না শেষ! এরপর আধ ঘণ্টা নেচে গেয়ে যখন মাতোয়ারা সবাই তখন আরেকটি চমকের ঘোষণা আসলো উপস্থাপকের কণ্ঠে। সবার অবাক দৃষ্টি! এত কিছুর পর আর কত চমক? টিএসসির খোলা মাঠে আতশবাজির ঝলকানি শুর" হবে একটু পরই – উপস্থাপকের এমন ঘোষণায় চিৎকারে ফেটে পড়ল সবাই। হুড়মুড়িয়ে মাঠে প্রায় হাজার খানেক দর্শক। টানা ১৫ মিনিট চললো রাতের আকাশে আলোর নাচন।

কোনো আয়োজনের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারণের আসল মাপকাঠি আয়োজকদের সন্তুষ্টি নয়, বরং দর্শকদের পরিতৃপ্তি। তারপরও বলব, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব আমার দেখা যেকোনো উৎসবের মধ্যে অদ্বিতীয় – কি বিভাগে, কি বিভাগের বাইরে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত দর্শকদের চোখে মুখে দেখেছি আনন্দ। দেখেছি অহঙ্কারের স্পষ্ট ছাপ। যার সাথেই আলোচনা হয়েছে, শুনেছি একটি মাত্র কথা: বিভাগের ইতিহাসে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুন্দর আয়োজন এই সুবর্ণজয়ন্ড়ী উৎসব। আর পরদিন সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে প্রশংসার ফুলঝুরি দেখে মনে হয়েছে আয়োজকদের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার যে মূল্যায়ন, তা আত্মম্ভরিতাপূর্ণ নয় বরং আর সবার সমান্ড়রাল।

পরদিন কলাভবনের সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম টিএসসির দিকে। কাকতালীয়ভাবে একই জায়গায় সেই বন্ধুটির সাথে আবার দেখা। সে একটু টিটকারির সুরেই বললো: অনুষ্ঠান তো শেষ। এবার কি জনাবের একটু সময় হবে?

দ্র"তগতিতেই হাঁটছিলাম। এবার গতি কমিয়ে নয়, থামিয়েই বললাম: স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজটা এখনও বাকি। তাই আরো কয়েকটা দিন ব্যস্ড় থাকতে হবে। একেবারে শেষ করেই কথা হবে বন্ধু ...।

আল আমিন খান: শিক্ষার্থী, এমএসএস, ২য় ব্যাচ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫০ বছর উদযাপন কমিটি

উপদেষ্টা
অধ্যাপক আখতার সুলতানা, চেয়ারপারসন

আহ্বায়ক
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সদস্য
ফাহমিদুল হক (চলচ্চিত্র উৎসব ও প্রকাশনা)
শাওন্ড়ী হায়দার (আলোকচিত্র প্রদর্শনী)
সাইফুল হক (অর্থ ও হিসাব)

শিক্ষার্থী সদস্য
আল-আমিন খান (প্রকাশনা)
মাহবুবুল হক ভূঁইয়া (চলচ্চিত্র উৎসব)
তানভীর ফরহাদ শামীম (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)
মেহনাজ হক (আলোকচিত্র প্রদর্শনী)